মানব সভ্যতার আধুনিক যুগ

উষাকান্ত দত্ত

Written in accordance with the New Syllabus in History for Class VIII as notified by the West Bengal Board of Secondary Education and also recommended as a Text Book for the academic session 1985 and onwards [Vide the Board's Notification No. S/412 dated 27.12.83 and also Circular No Syll/84/3/82 dated 29.11.84]

মানব সভ্যতার আধুনিক যুগ

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

উষাকান্ত দত্ত, এম. এ., বি. টি. (পদক প্রাপ্ত)
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

প্রকাশক :
আনন্দকুমার পাল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৮২
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৮৪
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট, ১৯৮৬
পঞ্চম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৮৭

মূল্য : ষোল টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :
এ. কুমার
শ্যামা প্রেস
২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

॥ সবিনয় নিবেদন ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম অনুসারে **অষ্টম শ্রেণীর** জন্য ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হল। এবার আর প্রাক্ অনুমোদনের প্রশ্ন নেই। সুতরাং আপাতত প্রথম বৎসর 'মুড়ি-মুড়কি'-র এক দর।

এবারে পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু মানুষের সভ্যতার আধুনিক যুগের কাহিনী। সভ্যতা যতই এগোয় ততই এসে যায় নানা সূক্ষ্ম জটিলতা। সেদিক থেকে আধুনিক যুগের ইতিহাস গ্রন্থনও এক জটিল কাজ, বিশেষ করে সেই কাজটি যখন সম্পূর্ণ করতে হয় বিদ্যালয় স্তরের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য, যাদের বিচারবোধ, বাস্তব-বোধ ও সমস্যা-সমাধান সক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এর ওপর বিষয়বস্তু বিন্যাসেও যদি দৃষ্টিভঙ্গীর ঘটে যায় বিশেষ তারতম্য, সে তারতম্য যতই বাঞ্ছিত এবং যুগোপযোগী হোক না কেন, সব দিক থেকে উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে তার গতানুগতিকতায় ভেসে যাবার আশংকা সর্বক্ষণই থাকে প্রবল। বর্তমান গ্রন্থ রচনাকালে এ কথাগুলো বারংবার মনে এসেছে। বিদ্বজ্জন ইতিহাস-বেত্তা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সকল কথাগুলো ভেবে দেখতে পারেন।

সমগ্র পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনায় শ্রীসুকুমার বসু আমাকে নিরলসভাবে সাহায্য করেছেন। বন্ধুবর শ্রীপ্রিয়ব্রত রক্ষিতের স্বতঃপ্রণোদিত উপদেশ আমাকে নানাভাবে উপকৃত করেছে। স্থানীয় সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীদীপেন চন্দ আমাকে সাহায্যকারী বই সরবরাহে ছিলেন সর্বদাই উদার এবং উন্মুক্ত।

কোচবিহার
বিজয়া দশমী, ১৩৮৮

উষাকান্ত দত্ত

সূচীপত্র

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

আধুনিক যুগের সূচনা

বিষয়-সংকেত

মানুষের ইতিহাসে একটা যুগ পেরিয়ে অন্য যুগের এক দীর্ঘ প্রস্তুতির ক্রমিক পরিণতি। মধ্যযুগ চলাকালেই কিভাবে আধুনিক যুগের আগমন সূচিত হয়েছিল এবারে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ সামন্ততন্ত্রের ব্যর্থতা ॥

বেঁচে থাকার তাগিদটাই মানুষের সকল সংগ্রামের মূলকথা। যুগ যুগ থেকে মানুষ কেবল সেই চেষ্টাই করে এসেছে কি করে দৈনন্দিন জীবনধারণ প্রণালীকে সহজ ও সাবলীল করা যায়। এই চেষ্টাতেই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন করেছে। আবার পরবর্তীকালে প্রয়োজন বোধে গৃহীত প্রথা পরিত্যাগ করেছে অথবা পরিবর্তন করে নিয়েছে। যেমন, প্রাচীন যুগে দেখা যায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হত দাসপ্রথার সাহায্যে। মধ্যযুগে এসে দাসপ্রথা পরিত্যক্ত হল, এল সামন্তপ্রথা। আবার আধুনিক যুগে এসে দেখা গেল, এই সামন্তপ্রথারই অবসান ঘটানোর ক্লান্তিহীন প্রয়াস। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পরিবর্তন এত অপরিহার্য হয়ে ওঠে কেন ?

॥ পরিবর্তনের সূচনা ॥

সামন্তপ্রথার কথাই ধরা যাক। সামন্তপ্রথা ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। সে সময় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই ছিল মানুষের যা কিছু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু নানাভাবে মানুষের প্রয়োজন তো কেবল বেড়েই চলে। এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতেই মানুষ বাধ্য হয় উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে। আবার সেই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্যভাবেই নিয়ে আসে পরিবর্তন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও। মধ্যযুগে উৎপাদন পদ্ধতি ছিল মানুষের কায়িক শ্রমনির্ভর। কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে প্রয়োজন হল অল্প শ্রমে অধিক উৎপাদন। চাহিদা বেড়ে যাবারও ছিল নানান কারণ। একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন স্থান আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রও হচ্ছিল ক্রমশ সম্প্রসারিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই যে নতুন সম্ভাবনা তা উৎপাদন বৃদ্ধিকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল।

উৎপাদন পরিবর্তন

কিন্তু যখন ক্রমশ উৎপাদন বৃদ্ধি একান্তই জরুরী হয়ে দাঁড়ালো, দেখা গেল সামন্তপ্রথা এই পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে অন্বেষণ করতে হল নতুন কোন ব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থাও এসেছিল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

॥ কৃষি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ॥

স্বভাবতই নতুন পদ্ধতি অনুসন্ধানের প্রথম প্রয়াস কৃষি-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। স্বল্প শ্রমে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে দেখা গেল চিরাচরিত কৃষিকর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন না করতে পারলে তা হবার নয়। সুতরাং আরম্ভ হল নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, একই জমিতে একই ফসল চাষ করলে সেই ফসলের উৎপাদন কমে যায়; সুতরাং আরম্ভ হল নানা ধরনের ফসল উৎপাদনের চেষ্টা। আবার ভাল বীজ ব্যবহার করে প্রয়োজনমত সার দিয়েও যে উৎপাদন বাড়ানো যায় তাও ক্রমশ মানুষ জেনে ফেললো। এইভাবে ধীরে ধীরে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে উঠলো এক বিরাট পরিবর্তন।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি

কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই সেই সামাজিক কাঠামোকেও প্রভাবিত করতে লাগলো, যে কাঠামো গড়ে তুলেছিল সামন্ততন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, প্রয়োজনের এই পরিবর্তনকে মেনে নেবার ক্ষমতা ছিল না সমাজতন্ত্রের। তাই দরকার পড়লো এক নতুন ব্যবস্থার।

উৎপাদন বৃদ্ধির ফল

॥ শিল্প ব্যবস্থায় পরিবর্তন ॥

এতো গেল কেবল কৃষিকাজের কথা। শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমশ এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে লাগলো। মধ্যযুগেই নতুনভাবে শহর গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে এক শ্রমিক সম্প্রদায় ক্রমশ গড়ে উঠছিলো। তখন তারা নিজ নিজ শহরের সীমাবদ্ধ চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলো। ব্যবসায়িগণ নানান দেশ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চাহিদার কথা জেনে নিয়ে সেই চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্য নিজ নিজ দেশে উৎপাদন করতে উৎসাহিত হল। তখন দেখা গেল, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বিচিত্র চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব নয়। ব্যবসায়িগণ নিরুপায় হয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে অর্থ সাহায্য দিয়ে এক পৃথক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে লাগলো। এইভাবে ধীরে ধীরে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সামন্তপ্রথার অবসান সূচিত হয়। দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের তাগিদে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনেরও চেষ্টা আরম্ভ হল ব্যাপকভাবে।

শিল্প উৎপাদনে পরিবর্তন

শুধু তাই নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী, যাতায়াত ব্যবস্থার নানান অসুবিধে দূরীকরণ, নানা ধরনের দ্রুতগামী নিরাপদ যানবাহন আবিষ্কার। এইসব কাজেও এ সময় থেকেই ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবসা বিস্তারের ফল

॥ বহুমুখী পরিবর্তনের প্রভাব ॥

মানুষের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমশ যে পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে এসে যাচ্ছিল তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী। পরিবর্তন যে কেবল উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকেও এক নতুন অভিজ্ঞতায় ক্রমশ অভিজ্ঞ করে তুলছিল। যে সমাজতন্ত্র এতকাল মানুষের সমাজকে একটা ব্যবস্থায় অভ্যস্ত করেছিল, আজ সেই সামন্ততন্ত্রেরই ব্যর্থতায় ধীরে ধীরে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে লাগলো। আজকের আমাদের যে সমাজ জীবন তা তো এই সময় থেকে যে পরিবর্তন শুরু হল তারই ক্রমিক পরিণতি।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

নতুন নতুন দেশের আবিষ্কার এবং ক্রমশ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কৃষিজ ও শিল্পজ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তনের জোয়ারেই অবসান হল সামন্ততন্ত্রের, সূচনা হল আধুনিক যুগের।

অনুশীলনী

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। সামন্তপ্রথার মূল ভিত্তি কি ছিল? এই প্রথায় উৎপাদন ব্যবস্থা কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল? এই উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এল কিভাবে?

২। সামন্ততন্ত্রের শেষ ভাগে কৃষি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। উৎপাদন বৃদ্ধি মানুষের পক্ষে জরুরী হয়ে দাঁড়ায় কেন?

২। কৃষিক্ষেত্রে মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কি কি উপলব্ধি করলো?

৩। মধ্যযুগে শিল্প শ্রমিক-সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে?

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

১। নীচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ

(অ) চাহিদা না থাকাতে প্রয়োজন হল অল্প শ্রম ও বেশী উৎপাদন।

(আ) সামন্ততন্ত্র ছিল মূলত শিল্পভিত্তিক।

(ই) উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকেই শুধু প্রভাবিত করলো।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) নতুন — আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

(আ) ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হল উন্নত—ব্যবস্থা।

(ই) মধ্যযুগের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল মানুষের—শ্রমনির্ভর।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। মানুষের সংগ্রামের মূল কথা কি ?

২। আধুনিক যুগের প্রধান প্রয়াস কি ?

৩। ব্যবসায়িগণ উৎপাদন ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন এনেছিল ?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

আধুনিক যুগ ঃ

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ সামন্তপ্রথার অবক্ষয়—কৃষি উৎপাদন প্রণালীর কিছু উন্নয়ন—শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পশ্চাতে নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের অবদান—ইহার প্রভাব।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ইউরোপের নবজাগরণ

বিষয়-সংকেত

ঘনঘোর অমানিশার পর যেমন চন্দ্রালোকিত রজনী, তেমনি মানুষের ইতিহাসে আজকের হতাশা দূর হয়ে যায় আগামী দিনের নতুন সম্ভাবনার উদ্দীপনায়। ইউরোপের নবজাগরণ তেমনি এক উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাই এবার আলোচনা করা হবে।

॥ নবজাগরণের সূচনা ॥

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ইউরোপের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। পন্ডিতেরা এই সময় থেকেই মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আমরা তো জানি, মানুষের ইতিহাসে আকস্মিকভাবে কোন যুগের অবসান বা সূচনা হতে পারে না, বরং এর পেছনে থাকে এক দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রস্তুতি। এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

নানা কারণে মূল ইউরোপ থেকে বহুলোক পূর্ব রোম সাম্রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। যাবার সময় তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ফলে তারা মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্যুত হলেও নিজস্ব ভাবধারা থেকে নির্বাসিত হয় নি। তারপর ধর্মযুদ্ধ চলাকালে যখন আবার নতুনভাবে ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের যোগাযোগ হয়, তখন ইউরোপ তার নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতাকে আরেকবার জানবার সুযোগ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের যা নিজস্ব সংস্কৃতি তার পরিচর্যা চলেছিল ইউরোপের বাইরে এবং তা নিরবচ্ছিন্নভাবেই।

ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

ঠিক এই অবস্থায় ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন আরবীয়দের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটলো তখন বহু ইউরোপীয় যারা ঐস্থানে বসবাস করছিল তারা আবার ইউরোপে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এবারও যথারীতি তারা ফিরে আসবার সময় প্রাচীন সভ্যতার নানা সংস্কৃতির নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে আসে। এদের সাহায্যেই সমগ্র ইউরোপ আরেকবার যেন নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করার সুযোগ পায়। এই যে ইউরোপ নিজেকে নতুনভাবে চেনার, জানার এবং বোঝার সুযোগ পেল—একেই ইতিহাসে 'নবজাগরণ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন

॥ নবজাগরণের স্বরূপ ॥

সমগ্র মধ্যযুগ যেন ইউরোপের কাছে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতার কথা বিস্মৃত হয়ে এই সমগ্র ইউরোপ যেন ধর্মের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। নানা রকমের বিধি-নিষেধ মানুষের জীবনকে এমন অক্টোপাসের মত বেঁধে রেখেছিল যে, মানুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার, কাজ করবার কোন সুযোগ ছিল না। একদিকে পোপ অন্যদিকে সম্রাট উভয়ের শাসনদণ্ড মানুষকে এক লৌহ-কঠোর আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এই আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসবার কোন পথের নিশানা মানুষের জানা ছিল না। দুঃসহ হতাশা আর দুর্বহ বিস্বাদ মানুষকে জর্জরিত করে রেখেছিল।

তদানীন্তন সময়

এই যখন ইউরোপের জন-জীবনের অবস্থা, ঠিক তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতনের ফলে ইউরোপ যেন চকিত-বিদ্যুৎ-চমকের মত নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতির নিবিড় উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করে। তারা অবাক হয়ে দেখলো, সমগ্র মধ্যযুগ-ব্যাপী মানুষকে নিষ্ঠুর শাসনে বেঁধে রাখবার যে অপচেষ্টা চলছে তা এক প্রচণ্ড মিথ্যার মায়াজাল মাত্র। এই মায়াজাল ছিন্ন করে মানুষের বেরিয়ে আসবার যে প্রয়াস তাই হল **ইউরোপের নবজাগরণ।**

প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি এই জাগরণের যেন সোনার কাঠির কাজ করেছিল। কারণ ঐ প্রাচীন সংস্কৃতির মূল কথাই ছিল আনন্দময় মুক্ত জীবনের আস্বাদন লাভ। গ্রীস ও রোমান সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে এই মুক্ত জীবনের জয়গান বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। নবজাগরণের ফলে মানুষ জীবনকে নতুনভাবে দেখবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার মানসিক ক্ষমতা ফিরে পেল। মধ্যযুগে মানুষকে বুঝতে বাধ্য করা হয়েছিল, ইহলোক অর্থহীন ও দুঃখময়, সুতরাং যা কিছু করণীয় তা হল পরলোকে স্বর্গীয় সুখলাভের জন্য। কিন্তু নবজাগরণ তাকে বুঝতে শেখালো, পরলোকের অস্তিত্ব যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং পরলোকের কল্পিত স্বর্গীয় সুখকে বাস্তব রূপ দিতে হবে ইহলোকেই। এই শিক্ষাই মানুষের দেখবার চোখ আর বোঝবার মনটাকে তৈরী করে দিল। এখন আর মানুষ আগে থেকে আরোপিত কোন বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে চাইলো না। পরলোকের পরিবর্তে ইহলোককেই সুশোভিত করে তুলতে উৎসাহিত হল। জাগতিক সকল ঘটনাবলীকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ হল। অবশ্য মানুষের এই যে নতুন পথ পরিক্রমা তা কিন্তু খুব সহজে হয় নি। কারণ ধর্মযাজকগণ তখনো পুরোনো ধ্যান-ধারণাকেই আঁকড়ে ধরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এতে তো তাদের স্বার্থই সংরক্ষিত হত। তাই মানুষ যতটাই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতো, তারা ততটাই চেষ্টা করতো মানুষকে পেছনে টেনে রাখতে।

প্রাচীন সভ্যতার মূলকথা

॥ নবজাগরণের সূচনা—ইটালী ॥

ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ইটালীতে সর্বপ্রথম নবজাগরণ আরম্ভ হয়। ইটালী ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। মধ্যযুগেও শিল্প, সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চায় ইটালী ছিল বিখ্যাত। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ইটালীর অনেক নগর বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যেমন ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস প্রভৃতি। *ইটালীর বন্দরগুলোও* তখনকার দিনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে নানা দেশের নানা লোকের নিয়মিত আনা-গোনায় ভাবের আদান-প্রদানের এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এই বন্দরগুলো। তাছাড়া ইটালীর বিভিন্ন শহরে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পীদের তৈরী অনেক মূর্তি ছিল। এই মূর্তিগুলো নবজাগরণ কালের শিল্পীদের নতুনভাবে উৎসাহিত করে। সারা দেশব্যাপী মঠ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাদরে ফেলে রাখা অনেক বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহ আবার নতুনভাবে অনুসন্ধান করা হল। এসব কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হলেন বিখ্যাত মেডিচি পরিবারের মত কয়েকটি বর্ধিষ্ণু ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন পরিবার। এইসব পরিবার প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য আলোচনায় খুবই উৎসাহিত ছিলেন। এঁদেরই উদ্যোগে নবজাগরণের ফলে সাধারণ জনজীবনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশেষভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে।

ইটালীর ভৌগোলিক অবস্থান

অভিজাত পরিবারের ভূমিকা

ইটালীর বিভিন্ন নগরের মধ্যে নবজাগরণ কালে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে ফ্লোরেন্স। তারপর ফ্লোরেন্স থেকে ক্রমশ নবজাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে যায় মিলান, রোম ও অন্যান্য শহরে। তারপর আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে নবজাগরণের চেতনা প্লাবিত করে জার্মানি, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ।

॥ চিন্তাজগতের নবজাগরণ ॥

নবজাগরণের যে চেতনা তাকে বলা হয় মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম্—এ কথার অর্থ হল, ভগবান নয়, মানুষই-ই সর্বশক্তিমান। সুতরাং মধ্যযুগে যে শেখানো হত ইহলোক দুঃখময়—তাই মানুষকে তৈরী হতে হবে পরলোকে সুখ ভোগের আশায়—এ কথার কোন যুক্তি নেই। কারণ যেখানকার জীবন আমরা দেখতে পাই না সেখানকার সুখ-দুঃখে আমাদের কি এসে যায়। তাই যে পৃথিবীতে আমরা জন্মেছি, বেঁচে আছি, তাকে ভোগ করা এবং তাকে সুন্দর করে তোলাই হল আমাদের সাধনা। প্রাচীনকালে এথেন্স ও রোমের লোকেরা এই জীবনকে ভোগ করার জন্যই যাবতীয় চেষ্টা করেছেন। এর প্রমাণ পাই তখনকার সাহিত্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে। এইভাবে মানবতাবাদে মানুষের মনুষ্যত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হল এবং তাকে ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হল।

মানবতাবাদের তাৎপর্য

এই প্রয়াসের প্রকাশ ঘটলো তখনকার সাহিত্যে। এ সময়ের বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ফ্লোরেন্সের পেত্রার্ককে বলা হয় প্রথম মানবতাবাদী। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের নাম 'সনেটস্ টু লরা'। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করে দেশবাসীকে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ করতে উদ্যোগী হলেন।

পেত্রার্ক

পেত্রার্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বোকাচিও ছিলেন বিখ্যাত গল্প-লেখক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ডেকামেরন'। পেত্রার্ক ও বোকাচিও উভয়ের রচনাতেই থাকতো মানুষকে ভালবাসার কথা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা, আলো আর আনন্দের কথা। তাই লোকে পাগলের মত তাঁদের কথা শোনবার জন্য ছুটে আসতো।

বোকাচিও

এ সময়ের আরেকজন হলেন ইটালীয় মহাকবি দান্তে। তিনি তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি'র জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই মহাকাব্যে তিনি জীবন ও মৃত্যু, ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটি তিনি তাঁর বিখ্যাত শিল্পীবন্ধু জিয়েত্তোর মৃত্যুতে রচনা করেছিলেন।

দান্তে

দান্তে

শেক্সপীয়র

নবজাগরণের প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্যেও এল নতুন চেতনা। ইংরেজী সাহিত্যেরও হল অভাবনীয় উন্নতি। এ সময়ের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগণ হলেন উইলিয়ম শেক্সপীয়র, ফ্রান্সিস বেকন, এডমণ্ড স্পেন্সার, চসার প্রভৃতি। শেক্সপীয়র

তো ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটকগুলো আজও সমান জনপ্রিয়। এই নাটকগুলোতে যে মানব-চরিত্র জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা মেলে না। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত নাটক হল ওথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, এ্যাণ্টনী-ক্লিয়োপেট্রা, এ্যাজ য়ু লাইক ইট ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের সাহিত্য

দার্শনিক স্যার ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলো পাণ্ডিত্য ও সরলতায় অনবদ্য।

ফ্রান্সিস বেকন

শেক্সপীয়রের আগে ইংরেজী সাহিত্যের দুই বিখ্যাত কবি হলেন জিওফ্রে চসার ও এডমণ্ড স্পেন্সার। চসার তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ক্যাণ্টারবেরী টেল্স' গ্রন্থে লোকচরিত্র অংকনে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। স্পেন্সার তাঁর 'ফেয়ারী কুইন' নামক কাব্যে

চসার

ইরাসমাস

তখনকার ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের জীবনকাহিনী চমৎকার রূপকের আড়ালে প্রকাশ করেছেন।

হল্যাণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক ইরাসমাস তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষায় মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অবিচারকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে যুক্তিবাদী করে তোলা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশকে সংস্কার মুক্ত করা। রাজনীতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত পণ্ডিত মেকিয়াভেলি। তাঁর রচিত গ্রন্থের

নাম 'দি প্রিন্স'। গ্রন্থটি তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থনে রচনা করেন। গ্রন্থে দেশের রাজা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে, কিভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে।

মেকিয়াভেলি

রাবেল

স্পেনের সারভান্তিস তাঁর 'ডন্ কুইক্সোট' নামক উপন্যাসে মধ্যযুগের নাইট-এর মিথ্যা বীরত্বের ভড়ং-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। উদ্ভট সব ঘটনা দিয়ে সাজানো বইটির আকর্ষণ এখনো কমে যায় নি।

সারভান্তিস

ফরাসী ঔপন্যাসিক রাবেল তাঁর উপন্যাসে তখনকার দিনের পণ্ডিতসমাজ, পাদ্রীসমাজ এবং সৌখীন সামন্তদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন।

তাহলে দেখা গেল নবজাগরণের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে-সব সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার দুটো দিক। ঐ সব সাহিত্যে একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় যা কিছু অন্যায়, অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব ও সৌন্দর্যবোধ উদ্বোধনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

॥ শিল্পকলায় নবজাগরণ ॥

নবজাগরণ কালে শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিল্পীদের কৃতিত্ব সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইউরোপের শিল্পচর্চায় এই এক গৌরবময় সময়। মধ্যযুগে শিল্পীদের কোন স্বাধীনতাই ছিল না। ছবির বিষয়বস্তু এবং ছবিতে রং-এর ব্যবহার সম্পর্কেও শিল্পীদের একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে কাজ করতে হত। নবজাগরণ এইসব নিয়ম-কানুন নস্যাৎ করে দিয়ে শিল্পীকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা এনে দিল। শিল্পীও আপন মনের মাধুরী মিশায়ে নিত্য নতুন শিল্পসৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠলো।

বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির পরিবর্তন

নবজাগরণ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন বিশ্ববন্দিত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি যেভাবে জীবনকে দেখেছেন, ভালবেসেছেন সেভাবেই জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য ভাবে তাঁর ছবিতে। এদিক থেকে তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। প্রতিকৃতি অংকনেই তাঁর ছিল অপরিসীম দক্ষতা। তাঁর আঁকা 'মোনালিসা' ছবিখানি আজিও বিশ্ববাসীর কাছে এক বিরাট বিস্ময়। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত ছবি হল 'দি লাস্ট সাপার'।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

লিওনার্দোর সমসাময়িক আরেকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন রাফায়েল। রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জার অঙ্গসজ্জার জন্য রাফায়েল বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ছবির মধ্যে ম্যাডোনা বা মাতা মেরীর ছবিগুলোই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই

ম্যাডোনা (রাফায়েল)

ছবিগুলোতে ম্যাডোনার মাতৃভাব এমন চমৎকার ফুটে উঠেছে যে অবাক হয়ে যেতে হয়।

লিওনার্দোর মতই এ সময়কার আরেক বিরাট শিল্পী ও ভাস্করের নাম হল মাইকেল এঞ্জেলো। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভাস্কর্যের নির্মাণ কৌশল যদি চিত্রশিল্পে

রাফায়েল

মাইকেল এঞ্জেলো

নিয়ে আসা যায় তা হলেই তা হয়ে ওঠে অপরূপ। তাই দেখা যায় লিওনার্দোর

পুণ্য পরিবার (মাইকেল এঞ্জেলো)

ছবিতে যেখানে কোমল পেলবতা মাইকেল এঞ্জেলোর ছবিতে সেখানে সুঠাম শরীরে

মাংস পেশীর সৌন্দর্য। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন ভ্যাটিকান প্রাসাদের সিস্‌তিন গীর্জার চাঁদোয়ার অঙ্গসজ্জায়। দীর্ঘ চার বৎসর রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে তিনি ওল্ড টেস্টামেণ্টের নানা কাহিনী ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন। সে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শোনা যায়, দীর্ঘদিন ধরে গীর্জার অল্প আলোয় কাজ করবার ফলে পরে আর তিনি দিনের আলো সহ্য করতে পারতেন না।

সুতরাং দেখা গেল মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক শিল্পকলার সঙ্গে নবজাগরণ কালের শিল্পচর্চায় পার্থক্য হল, এই সময়ের শিল্পকলার মূল বিষয়ই ছিল, মানুষ এবং তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে রূপায়িত করা।

॥ বিজ্ঞানে নবজাগরণ ॥

সাহিত্য ও শিল্পে নবজাগরণের চিন্তাধারা প্রকাশ করা যত সহজ ছিল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ছিল না। কারণ মানুষের যে ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মূলধন করে মধ্যযুগীয় অত্যাচার চলছিল, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ও বিস্তার ঘটলে ঐ অত্যাচার আর সম্ভব হবে না। তাই প্রথম থেকেই যাজক-সম্প্রদায়ের চেষ্টা ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যথাসাধ্য বাধা সৃষ্টি করা। এরই ফলে প্রথম দিকের বৈজ্ঞানিকদের উপর চলেছিল নিদারুণ উৎপীড়ন।

বিজ্ঞানের ভূমিকা

এমনি এক বিজ্ঞানী হলেন ইংল্যাণ্ডের রোজার বেকন। তিনি বলতেন, বিজ্ঞানের কাজই হল প্রকৃতিকে মানুষের সাহায্যকারীতে পরিণত করা। তাই তিনি যন্ত্রচালিত জাহাজ, গাড়ী, উড়োজাহাজ প্রভৃতি নির্মাণের সম্ভাবনা বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল তখনকার দিনের যাজকদের স্বার্থের বিরোধী। তাই তাঁকে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কারাবাস ভোগ করতে হয়।

রোজার বেকন

প্রধানত পরিচয় শিল্পী হিসেবে হলেও বিজ্ঞানী হিসেবেও লিওনার্দো খুব কম ছিলেন না। মিলানের জল সরবরাহের ব্যবস্থা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই হয়েছিল। তাঁর ডায়েরীতে তাঁতের নক্সা, মাটি কাটার নক্সা, এমন কি প্যারাসুট ও হেলিকপ্টারের নক্সাও পাওয়া গিয়েছে। স্বভাবতই তাঁর সম্পর্কে যাজক-সম্প্রদায়ের মনোভাব খুব প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু তিনি তো একদিকে ছিলেন যেমন বিখ্যাত শিল্পী অন্যদিকে আজীবন ভবঘুরে। তাই তাঁর প্রতি নির্দয়তা প্রকাশের বড় একটা সুযোগ যাজকগণ পান নি।

লিওনার্দো

ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা প্রবন্ধকার স্যার ফ্রান্সিস বেকন বিজ্ঞান সম্পর্কেও যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর একটি উপন্যাসে এক দূর দ্বীপে এক গবেষণাগারের কল্পনা করেছেন, সেখানকার বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত ছিল।

ফ্রান্সিস বেকন

এই পৃথিবী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধারণাকে সর্বাধিক আঘাত হানলেন পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপারনিকাস। পূর্বে ধারণা ছিল, পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে। কিন্তু কোপরনিকাসই প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ফলে এই পৃথিবী ভগবানের দান বলে যাজকগণ যে প্রচার করতেন তার অসারতা প্রমাণ হয়ে গেল।

কোপারনিকাস

গ্যালিলিও

ইটালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-ও কোপারনিকাসের মত সমর্থন করতেন। তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি সৌরজগৎ সম্বন্ধে নানা নতুন তথ্য প্রচার করেন। ফলে তাঁর উপরও যাজকগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত নিজের মত ভুল বলে প্রচার করে রেহাই পান।

গুটেনবার্গ
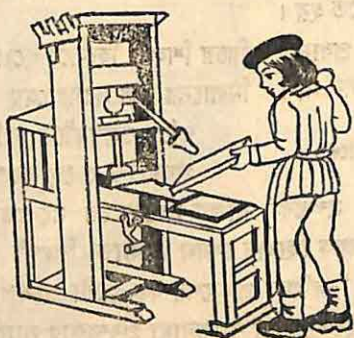
প্রাচীন মুদ্রাযন্ত্র

মানবসভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে এ সময়কার সবচেয়ে বড় অবদান হল মুদ্রাযন্ত্রের

আবিষ্কার। জার্মানীর মেইনজ শহরে জন গুটেনবার্গ প্রথম ছাপাখানা আরম্ভ করেন। তিনি সীসা দিয়ে অক্ষর এবং ছাপাবার যন্ত্রও তৈরী করেন। তাঁর ছাপাখানা থেকে ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা বই বের হয়। এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রগতি সম্ভব হল।

সুতরাং দেখা গেল, এই সময় বিজ্ঞানই মানুষকে তার অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল এবং এক নতুন জ্ঞানের জগতে প্রবেশের পথ খুলে দিয়েছিল।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নতুন চর্চাই ইতিহাসে নবজাগরণ। তাই এই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার প্রভাব দেখা গেল সাহিত্যে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে। মানুষের সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ ঘটলো নানাভাবে। সেই সব প্রকাশ মানুষের সভ্যতার বিস্ময়কর সঞ্চয়।

অনুশীলনী

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। কোন ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে আধুনিক যুগের সূচনা? কিভাবে আধুনিক যুগের সূচনা হচ্ছিল?

২। নবজাগরণ বলতে কি বোঝ? নবজাগরণের চেতনা মানুষের মধ্যে এল কিভাবে?

৩। প্রথম নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল কোথায়? কি কি কারণে সেখানে তা সম্ভব হয়েছিল?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। মধ্যযুগে সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল?

২। মধ্যযুগের শিক্ষার সঙ্গে নবজাগরণের শিক্ষার পার্থক্য কোথায়?

৩। মানবতাবাদ কথাটির অর্থ কি? এই মতবাদ মানুষকে কি বোঝাতে চাইলো?

(৪) নবজাগরণ কালে সৃষ্ট সাহিত্যের মূল বক্তব্য কি ছিল?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) — প্রথম মানবতাবাদী বলা হয়?

(আ) দান্তে তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছিলেন বন্ধু — স্মরণে।

(ই) — কাব্যে রানী এলিজাবেথের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
(ঈ) মধ্যযুগের নাইটদের বিদ্রূপ করা হয়েছে — উপন্যাসে।
(উ) লিওনার্দোর বিখ্যাত ছবির নাম —।
(ঊ) সেণ্ট পিটার্স চার্চের নক্সা করেছিলেন —।

২। 'ক' স্তম্ভে কতকগুলো গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। 'খ' স্তম্ভে কয়েকজন লেখকের নাম আছে। এই নামগুলো থেকে সঠিক নামটি বেছে নিয়ে 'ক' স্তম্ভের গ্রন্থগুলোর সঙ্গে মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ডিভাইন কমেডি	মেকিয়াভেলি
ম্যাকবেথ	দান্তে
ক্যাণ্টারবেরী টেল্স	স্পেন্সার
ফেয়ারী কুইন	চসার
দি প্রিন্স	শেক্সপীয়র

৩। নীচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ
(অ) কোপারনিকাস আবিষ্কার করেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।
(আ) লিওনার্দো চিত্রশিল্পে ভাস্কর্যের এক নতুন রীতির প্রবর্তন নিয়ে এসেছিলেন।
(ই) রাফায়েল ছিলেন একদিকে শিল্পী অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক।
(ঈ) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন রোজার বেকন।
(উ) কোপারনিকাস নিজের মত ভুল বলে প্রচার করে যাজকদের অত্যাচার থেকে রেহাই পান।

॥ (ঘ) **কর্মশিক্ষার নিদর্শন** ॥

১। নবজাগরণ কালের শিল্পচর্চার মূল কথা কি ছিল?
২। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে কিসে সাহায্য করলো?
৩। নবজাগরণ কালে বিজ্ঞান চর্চা সহজ ছিল না কেন?
৪। দার্শনিক ইরাসমাসের উদ্দেশ্য কি ছিল?
৫। ম্যাডোনার ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়ে আছেন কোন শিল্পী?

॥ (ঙ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। সমসাময়িক কালের একটি ইটালীর মানচিত্র এঁকে সেখানকার প্রধান প্রধান শহরগুলোর অবস্থান দেখাও।
২। নবজাগরণ কালের শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্মগুলোর নিদর্শন সংগ্রহ কর।

৩। এই সব শিল্পীদের জীবনকাহিনী আরও ভাল করে জানবার জন্য বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী' গ্রন্থটি পড়ো।

৪। শ্রেণীকক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন কর। আলোচনার বিষয় বস্তু: মহাপুরুষদের অসাধারণ কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

● ইউরোপের নবজাগরণ :

(ক) ইহার স্বরূপ : দ্বাদশ শতাব্দী হতে প্রবহমান এক বিবর্তনের ধারা কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন দ্বারা (১৪৫৩) উদ্দীপিত—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞান-চর্চার পুনরুজ্জীবন—বৈজ্ঞানিক সত্য ও যাথার্থের প্রতি শ্রদ্ধা—প্রাচীন গ্রীক জীবনচর্চার পুনঃপ্রতিষ্ঠা—পরলোক—চিন্তা ও যাজকের মধ্যস্থতার প্রতি অনাস্থা—প্রথাগত কর্তৃত্বে অবিশ্বাস—প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে ঐশ্বরিক কোন অবদানকে অস্বীকার—যুক্তিবাদী মন নিয়ে জীবন অনুসন্ধান—মানুষের গতানুগতিক সংস্কারকে জীইয়ে রাখবার জন্য ক্যাথলিক চার্চের ব্যর্থ প্রয়াস—ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে এক যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ ও প্রসার।

(খ) ইটালীর নেতৃত্বদান—শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্সের ধনী বণিকদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সেখান হতে মিলান, রোম এবং অন্যান্য নগর রাষ্ট্রে তার বিস্তার—অতঃপর আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে জার্মানি, ফ্ল্যান্ডার্স, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে উহার অনুপ্রবেশ।

(i) **চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ :**

পরিশীলিত মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের বিকাশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দান্তে, পেত্রার্ক, মেকিয়াভেলি, বোকাচিও, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, চসার, স্পেন্সার, শেকস্পীয়র, ইরাসমাস, সারভান্তিস ও রাবেলের অবদান।

(ii) শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :

অংকন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো।

(iii) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :

রোজার বেকন, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, গুটেনবার্গ (মুদ্রাযন্ত্র)।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

বিষয়-সংকেত

অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনি দুর্দমনীয় যে সেখানে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।' এভাবেই ক্রমশ পূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার। এমনি এক পূর্ণতার কাহিনী এবারে আমাদের আলোচ্য।

॥ ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ ॥

নবজাগরণ মানুষের চেতনায় যে জাগরণ ঘটিয়েছিল তারই ফলে মানুষ সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। এই কৌতূহলের টানেই সে একদিন অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার অপরিসীম আগ্রহে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু এই বেরিয়ে যাওয়ার কাজটা সেদিন খুব সহজ ছিল না। তবু নবজাগরণ কালেই দিক্ নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার ও নানাভাবে ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে সেদিন বাইরের জগতকে জানার কাজে নেমে পড়তে সাহস পেয়েছিল।
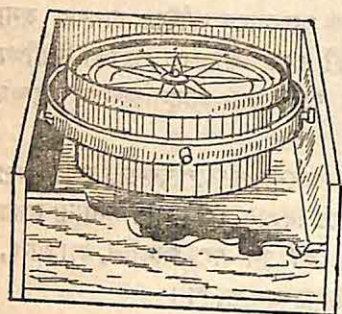
দিক্ নির্ণয় যন্ত্র

ব্যবসায় বিস্তার

শুধু তাই নয়! নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়। এটাও ভৌগোলিক আবিষ্কারে মানুষকে উৎসাহিত করেছিল।

মার্কোপোলো

ততদিনে মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী সারা ইউরোপে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। এই কাহিনীও আরো নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে মানুষের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

তা ছাড়া, কনস্ট্যান্টিনোপল আরবীয়দের হস্তগত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব কারণ মিলিয়ে এই সময় ইউরোপের নানা দেশ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের কাজে নেমে পড়ে। এই সব দেশের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেয় পর্তুগাল ও স্পেন।

পর্তুগীজ আবিষ্কারকগণের মধ্যে সবার আগে বলতে হয় পর্তুগালের যুবরাজ ইন্‌ফ্যান্ট হেনরীর কথা। তিনি মার্কোপোলর ভ্রমণকাহিনী পড়ে এত উদ্বুদ্ধ

হয়েছিলেন যে সমুদ্রপথে প্রাচ্যদেশে পেঁছাবার কাজে উৎসাহ দিতে থাকেন। ফলে সেখানকার নাবিকগণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পেঁছাবার চেষ্টা শুরু করে।
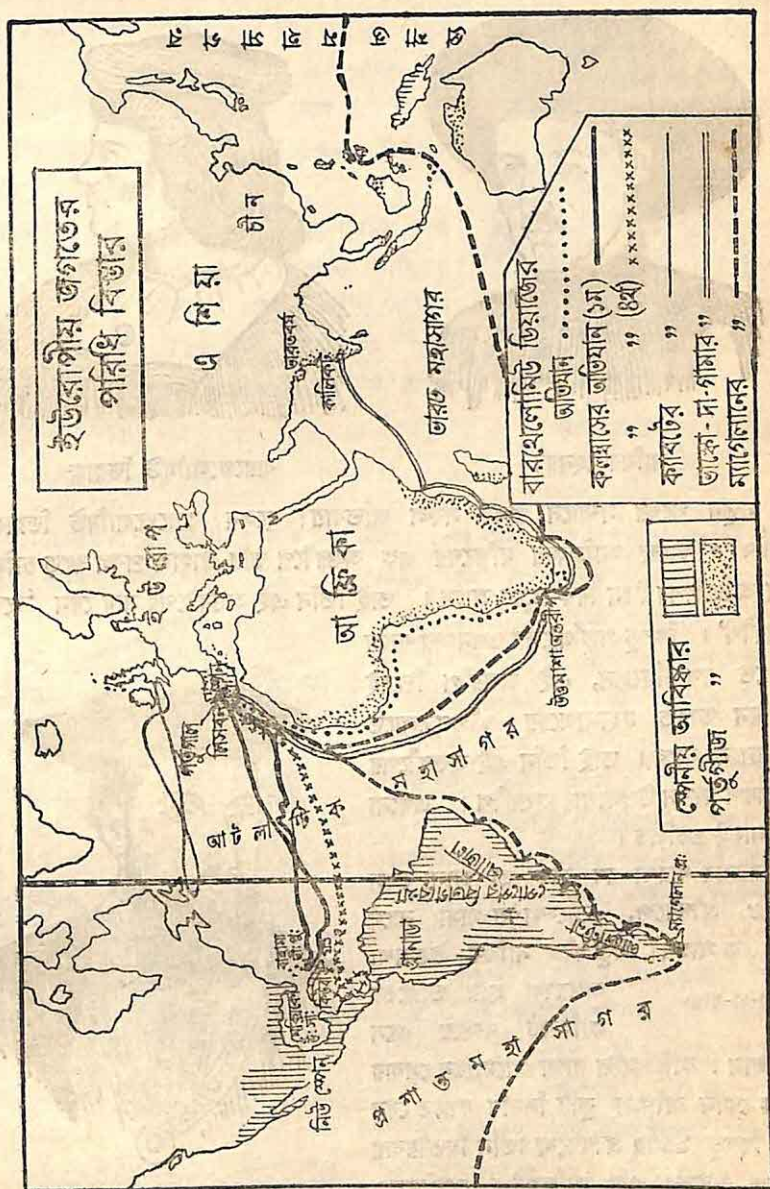
কিন্তু তাঁর জীবিত থাকাকালে এই সব চেষ্টার কোন সাফল্য আসে নি। এই

রাজকুমার নিজে কখনো সমুদ্রযাত্রায় বের হয় নি, কিন্তু নৌবিদ্যায় তাঁর আগ্রহের জন্যই তাঁকে বলা হয় নাবিক হেনরী।

নাবিক হেনরী

বারথেলোমিউ ডিয়াজ

নতুন পথের সন্ধানে প্রথম সফল অভিযাত্রী হলেন বারথেলোমিউ ডিয়াজ। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণের এক অন্তরীপে তাঁর জাহাজ প্রবল ঝড়ে চালিত হয়ে অন্তরীপের তিন দিক ঘুরে আসে। তাই তিনি এই অন্তরীপের নাম দেন 'ঝড়ের অন্তরীপ'। কিন্তু পর্তুগালের তখনকার রাজা বুঝতে পেরেছিলেন, এই অন্তরীপ দিয়েই একদিন ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে পেঁছানো যাবে। তাই তিনি এই অন্তরীপের নামকরণ করেন উত্তমাশা অন্তরীপ। এখনো এই নামই প্রচলিত।

রাজার ধারণা যে ঠিক তা জানা গেল ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভাস্কো-দা-গামা নামে আর এক সাহসী পর্তুগীজ নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পেঁছান। কালিকটের রাজা জামোরিন সেবার তাঁকে কোন বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করতে দেন নি। কিন্তু ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন এবং কালিকট ও কোচিনের রাজাদের বিবাদের সুযোগ নিয়ে ভারতে প্রথম পর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন।

ভাস্কো-দা-গামা

ভাস্কো-দা-গামা

এরপর ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আসেন আলবুকার্ক। তিনি হলেন ভারতে প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিজাপুরের আদিল শাহি সুলতানের কাছ থেকে গোয়া দখল করে নেন। তাঁর চেষ্টাতেই পর্তুগীজগণ পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে শক্তিশালী নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়।

আলবুকার্ক

আলবুকার্ক

তা ছাড়া, পেড্রো আলভারেজ কেব্রাল নামে আর এক জন পর্তুগীজ নাবিকও ভারতে এসে পেঁছেছিলেন ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি যে আসবার পথে আমেরিকা আবিষ্কার করে এসেছিলেন তা তিনি তখন জানতেন না।

কেব্রাল

॥ স্পেনীয় অভিযাত্রীগণ ॥

এই আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনীও অজানা ছিল, তার প্রথম আবিষ্কারক বিখ্যাত ইটালীয় নাবিক কলম্বাসের কাছেও। স্পেনের রানী ইসাবেলার সাহায্যে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন দেশে পেঁছাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারে বের হন। পাঁচ সপ্তাহ চলার পর তিনি বাহামা দ্বীপ-পুঞ্জে গিয়ে পেঁছান। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল তিনি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পেঁছেছেন। আসলে তিনি যে আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা তখন তিনি জানতেন না।

কলম্বাস

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালবোয়া নামে আর এক স্পেনীয় নাবিক চীন দেশের পথে বের হন। তিনি আজকের পানামায় অবস্থিত এক নতুন মহাসাগর দেখতে পান। তারপর একখানি জাহাজ নিয়ে সেই মহাসাগরের দিকে ধাবিত হন। এই মহাসাগরই হল প্রশান্ত মহাসাগর।

বালবোয়া

এই ঘটনার ছয় বৎসর পর ম্যাগেলান নামে আর এক অভিযাত্রী স্পেন সরকারের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে যান। তিনি এই মহাসাগর অতিক্রম করে

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও গিয়ে পোঁছান। যাবার পথে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার কাছে এক অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। এই অন্তরীপ এখন ম্যাগেলান অন্তরীপ নামে পরিচিত।

ম্যাগেলান

আমেরিগো ভেস্পুচি

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন ইটালীয় নাবিক, নাম আমেরিগো ভেসপুচি ব্রাজিলে গিয়ে পোঁছান। তাঁর নাম অনুসারেই আমেরিকার নামকরণ করা হয়েছে। আসলে কলম্বাসের নামকেই এই দেশের স্মরণীয় করে রাখা উচিত ছিল।

সুতরাং নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে স্পেন ও পর্তুগাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু তাতে যেন দুই দেশের মধ্যে কোন বিরোধ না বাধে সেই কারণে তদানীন্তন পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার দুই দেশের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত পৃথিবীকে ভাগ করে দেন। স্পেন পেল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আর পর্তুগাল পেল এশিয়া ও আফ্রিকা।

নবাবিষ্কৃত দেশ বন্টন

॥ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল ॥

ভৌগোলিক অভিযানের ফলে এই যে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হতে লাগলো তার সুফল-কুফল দুই-ই ছিল।

সুফলের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয়, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টার ফলে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নবাবিষ্কৃত দেশগুলোর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও মানুষের পরিচয় হয়।

ভৌগোলিক জ্ঞান

প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। তাই দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যেরও বিস্তার সম্ভব হল। ফলে এতকাল পর্যন্ত যেখানে ইউরোপের বাণিজ্য-ক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, এইবার সেখানে সেই ক্ষেত্র বিস্তৃত হল আট্‌লাণ্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে পৃথিবীব্যাপী।

বাণিজ্যের প্রসার

কুফলের মধ্যে মর্মান্তিক হল, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করেই থেমে থাকলো না, তারা চাইলো সেই সব দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতেও। এশিয়া ও আমেরিকার নিরীহ মানুষগুলোকে সেদিন তারা উচ্ছেদ করে বা অমানুষিকভাবে শোষণ করে নিজেদের সম্পদশালী করে তোলার প্রতিযোগিতায় নামলো। যেমন, আমেরিকা আবিষ্কারের পর ঐ মহাদেশের মেক্‌সিকো ও পেরুতে ছিল দুই প্রাচীন সভ্য সাম্রাজ্য। স্পেনের সৈন্য এই দুই সাম্রাজ্যই ধ্বংস করে। সেখানকার অধিবাসী রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। সেখানকার সোনা ও রুপার জোরে স্পেন নিজেকে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে।

শোষণের সূচনা

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

মানুষের সীমাহীন কৌতূহল আর বাণিজ্যের তাগিদ তাকে একদিন নতুন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আবিষ্কৃত হল অজানা সব দেশ। বাণিজ্যের বিস্তার হল। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হল। আবার এরই ফলে প্রভুত্ব বিস্তারের লোলুপ লালসায় আরম্ভ হল মানুষ কর্তৃক মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ।

অনুশীলনী

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। কি কি কারণে মানুষ ভৌগোলিক আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল আলোচনা কর।

২। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল? কিভাবে এই আবিষ্কার মানুষকে শোষণের পথ তৈরী করে দিয়েছিল?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। কোন যুবরাজকে নাবিক যুবরাজ বলা হত এবং কেন বলা হত?

২। আলবুকার্ক কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩। আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ কার নাম অনুসারে হয়েছে? ঐ মহাদেশের প্রকৃত আবিষ্কারক কে এবং কেন তিনি প্রকৃত আবিষ্কারক?

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের … ভ্রমণকাহিনী বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল।

(আ) বারথেলোমিউ ডিয়াজ যে অন্তরীপে গিয়ে প্রবল ঝড়ে পড়েছিলেন তার নাম …।

(ই) ভারতে প্রথম পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন …।

(ঈ) প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কারক হলেন …।

(উ) বিরোধ এড়াতে পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করেন।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীদের কি বলা হয় ?

২। স্পেন কেন এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয় ?

৩। ভৌগোলিক আবিষ্কারের আগে ইউরোপের বাণিজ্যিক এলাকা ছিল কোথায় ?

৪। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার কোন কোন দেশের মধ্যে পৃথিবীকে ভাগ করে দিয়েছিলেন ?

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশ** ॥

১। তোমার শহরের আশে পাশে দিয়ে প্রবাহিত নদীটির উৎস সন্ধানে বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে যাও।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ঃ

পরিবর্তিত অর্থনীতি ও ইটালীর নবজাগরণের মূলভাব পর্তুগাল ও স্পেনের দুঃসাহসী নাবিকদের উন্নতমানের বিভিন্ন যন্ত্রের (দিক্‌নির্ণয় ও উচ্চতামাপক যন্ত্র) সাহায্যে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করল – বারথেলোমিউ ডিয়াজ, প্রিন্স হেনরী, আলবুকার্ক, ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল, কলম্বাস, বালবোয়া, আমেরিগো ভেসপুচি, ম্যাগেলান।

ফলশ্রুতি ঃ (ক) মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি—নব আবিষ্কৃত মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিত।

(খ) জলপথে ভূপ্রদক্ষিণ।

(গ) বাণিজ্যের প্রসার—উপনিবেশ স্থাপন – ঔপনিবেশিক শোষণ—স্পেনীয় নাবিকদের রাজ্যজয়।

(ঘ) জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান।

———

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন

বিষয়-সংকেত

যে ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক, তাই যখন হয় শোষণের হাতিয়ার তখন তার বিরুদ্ধে লড়াইয়েও মানুষ হয় আপোষহীন, ক্লান্তিহীন। এমনি এক দীর্ঘ লড়াই-এর কাহিনী এবারে আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু।

যে নবজাগরণ ইটালীতে জীবনকে সুন্দর করে তুলে ভোগ করার আগ্রহ জাগিয়েছিল, সেই নবজাগরণ যখন আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করে মধ্য ও উত্তর ইউরোপে পৌঁছাল তখন তার লক্ষ্যের হল পরিবর্তন। এই অঞ্চলে নবজাগরণ প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বের করবার আগ্রহ সৃষ্টি করলো। তার কারণও খুব স্পষ্ট।

মধ্যযুগে যে ধর্ম ছিল মানুষের পরম নিশ্চিত আশ্রয়, ক্রমশ সেই ধর্মে ঢুকে পড়লো নানারকম কুসংস্কার, মিথ্যাচার, আরম্ভ হল ধর্মের নামে অত্যাচার। ক্যাথলিক ধর্মের ধর্মগুরু হলেন পোপ। তাঁর অধীনে বিভিন্ন স্থানে যে সব ধর্মযাজকেরা ছিলেন তাঁরা ভোগ-বিলাসে এমনভাবে মেতে ওঠেন যে প্রকৃত ধর্মীয় কার্যকলাপ তাঁরা ত্যাগ করেন। খ্রীষ্টান ধর্মের ত্যাগ, সততা ও মানুষকে ভালবাসা তাঁরা ভুলে গেলেন। পরিবর্তে তাঁদের নানারকম ভোগ-বিলাসের চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তাঁদের অর্থের লোভ এমন বেড়ে গেল যে বিভিন্ন দেশের রাজাদের পক্ষেও আর এমন অবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

তখনকার ধর্মীয় জীবন

॥ জন ওয়াইক্লিফ ॥

ক্যাথলিক ধর্মের এই শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারের স্পষ্ট দাবী উচ্চারণ করলেন ইংলন্ডের ওয়াইক্লিফ। তাই তাঁকে বলা হয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের শুকতারা। তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রত্যেকের বাইবেল পড়ার অধিকার আছে বলে ঘোষণা করলেন। তখনকার দিনে এমন দাবীর কথা ভাবাও যেত না। দেখতে দেখতে সারা ইংলন্ডে তাঁর সমর্থকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তাঁর সমর্থকদের বলা হত লোলার্ড। কিন্তু লোলার্ডগণ কৃষকদের বিদ্রোহ করতে উস্কানী দিচ্ছে এই অজুহাতে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়।

॥ জন হাস ॥

ইংলণ্ডে লোলার্ডগণ ব্যর্থ হলেও ওয়াইক্লিফের শিক্ষা বোহেমিয়াকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে সময় ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বোহেমিয়ার প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফলে যে সব ছাত্ররা প্রাগ্ থেকে অক্সফোর্ডে পড়তে যেত তারা ওয়াইক্লিফের বই-পত্র পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন জন হাস। ওয়াইক্লিফের মত তিনিও ধর্মের বিষয়ে পোপের একক কর্তৃত্ব মানতেন না। শেষ পর্যন্ত তাকে বিধর্মী ঘোষণা করা হয় এবং পুড়িয়ে মারা হয়।

॥ মার্টিন লুথার ॥

ওয়াইক্লিফ ও জন হাস ধর্ম সংস্কারের যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা তীব্র আকার ধারণ করলো জার্মানীর উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে। লুথার খ্রীষ্টান ধর্মের আসল কথা জানার ব্যাকুল আগ্রহে আইনপড়া ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ক্রমশ তিনি অনুভব করেন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই প্রকৃত ধর্ম। তাই মানুষকে তার কৃতকর্মের অপরাধ থেকে অন্য কেউ অব্যাহতি দিতে পারে না। এই অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র আন্তরিক অনুশোচনার মধ্য দিয়েই।

লুথারের বিশ্বাস

রোমের পোপ জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইনডালজেন্স নামে এক মুক্তিপত্র বিক্রয় করতেন। এই মুক্তিপত্র কিনে পাপী নাকি তার পাপের বোঝা হ্রাস করতে পারতো। সুতরাং এত সহজে পাপ করেও পাপের বোঝা থেকে রেহাই পাওয়ার আশ্বাসে মানুষও ব্যাপকহারে ইনডালজেন্স কিনতো, বিনিময়ে পোপেরও যথেষ্ট অর্থাগম হত।

ইনডালজেন্স

মার্টিন লুথার

কিন্তু লুথারের পক্ষে এই অন্যায় অর্থ সংগ্রহ পদ্ধতি মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। তিনি এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে পঁচানব্বই দফা এক প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করলেন। স্বভাবতই তাঁর এই কাজে পোপ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাঁকে রোমে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু লুথার না যাওয়াতে তাঁকে খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে বের করে দেওয়া হল। যে পত্র দ্বারা পোপ তাঁর এই সিদ্ধান্ত লুথারকে জানিয়েছিলেন, লুথার তা প্রকাশ্যভাবে পুড়িয়ে দিলেন।

এই যে সাহসিকতার সঙ্গে লুথার পোপের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলেন তা তাঁকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুললো এবং ক্রমশই তাঁর

সমর্থকের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। এ অবস্থায় লুথারকে আর উপেক্ষা করার উপায় থাকলো না। তাই শেষ পর্যন্ত জার্মান সম্রাট পঞ্চম চার্লস ওয়ার্মস্ শহরে এক ধর্মসভা আহ্বান করলেন এবং সে সভায় লুথারকে তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য আহ্বান জানালেন। পঞ্চম চার্লসের পক্ষেও আর এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকা সম্ভব ছিল না। কেননা ক্রমশ সমগ্র জার্মানী দুটো দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল। একদল প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থক, আর এক দল হল লুথারের দল, তাদের বলা হত প্রোটেস্ট্যাণ্ট, অর্থাৎ প্রতিবাদকারী দল।

ওয়ার্মসের সভা

যাই হোক, ওয়ার্মসের সভায় লুথার তাঁর মতের সত্যতা অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করলেন। ফলে জার্মান সম্রাট তাঁকে ধর্মের শত্রু বলে ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে কোন প্রকার আশ্রয়দান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু লুথার তাঁর এক বন্ধুর আশ্রয়ে থেকে খ্রীষ্টান ধর্মীয় পুস্তকসমূহ জার্মান ভাষায় লিখে প্রচার করতে লাগলেন। ততদিনে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁর মতবাদ দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলেও প্রকৃত ধর্ম-জ্ঞানের যে দীপ-শিখা তিনি মানুষের মনে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন তা কিন্তু নিভে গেল না।

সভার সিদ্ধান্ত

॥ জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের প্রসার ও পরিণতি ॥

ওয়ার্মসের সভায় যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পঞ্চম চার্লস সেগুলো কার্যকরী করার সুযোগ পান নি। কারণ এ সময়ই তাঁকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। আর সেই ফাঁকে লুথারের ধর্মমত জার্মানির নানাস্থানে ছড়িয়ে যেতে থাকে। এ সময়ই আর একটি ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য জার্মানি জুড়ে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ দমনে লুথার রাজন্যবর্গের পক্ষ সমর্থন করায় তাঁর ধর্মমতের প্রসার আরও দ্রুত হয়।

প্রসারের কারণ

যাই হোক, এদিকে যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করার পর পঞ্চম চার্লস আবার ধর্মসংস্কার আন্দোলন দমনে মন দিলেন। তিনি অগ্সবার্গ নামক স্থানে এক সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজারা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এখানেও লুথারপন্থীদের জব্দ করতে না পারায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হলেন। ফলে আত্মরক্ষার জন্য লুথারপন্থীগণ এক সংঘ স্থাপন করলো। এই সংঘ 'স্মল্ক্যাল্ডি লীগ' নামে পরিচিত। সুতরাং উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী হয়ে গেল।

স্মল্ক্যাল্ডি লীগ

শেষ পর্যন্ত ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অগ্সবার্গের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হল।

এই সন্ধিতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত আইনত স্বীকৃতি পেল। স্থির হল, দেশের রাজারা নিজেদের ইচ্ছেমত ধর্ম গ্রহণ করবেন। আর তাঁদের ধর্ম তাঁদের দেশের প্রজাদের ধর্ম হবে। যদি কোন প্রজা সেই ধর্ম গ্রহণ করতে না চায় তবে তাকে তার সম্পত্তিসহ দেশত্যাগ করতে দেওয়া হবে।

অগসবার্গের সন্ধি

এইভাবে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম জার্মানিতে একটি শক্তিশালী ধর্মে পরিণত হল।

॥ জার্মানির বাইরে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম ॥

শুধু জার্মানিতেই নয়, জার্মানির বাইরে উত্তরে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক; পশ্চিমে ফ্রান্স, স্পেন ও দক্ষিণে সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশেও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত ছড়িয়ে গেল। সুইজারল্যাণ্ডে নতুন ধর্মমতের প্রবক্তা ছিলেন জুইংলি নামে এক যাজক। তিনি লুথারের সমসাময়িক ছিলেন এবং লুথারের মতই ইনডালজেন্সের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও তাঁর ধর্মমতের সঙ্গে লুথারের মতামতের কিছু পার্থক্য ছিল।

সুইজারল্যাণ্ড ও জুইংলি

ক্যালভিন

এ সময়ের আর এক জন বিখ্যাত ধর্ম-সংস্কারক হলেন ফ্রান্সের জন ক্যালভিন। তিনি জেনেভা শহর থেকে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন।

তাঁরই একজন সুযোগ্য শিষ্য জন নক্স স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিলেন।

এই সময় ইংলণ্ডে রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরী। তিনি প্রথমে লুথারের মতবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর পত্নী স্পেনের রাজকন্যা ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য পোপের অনুমতি চাইলেন, পোপ পড়ে গেলেন দ্বিধায়। কারণ ক্যাথারিন ছিলেন আবার জার্মানির পঞ্চম চার্লসের আত্মীয়া। চার্লস-ই ছিলেন ইউরোপে পোপের প্রধান সহায়। সুতরাং পোপ অনুমতি দিতে গড়িমসি করার কৌশল নিলেন। ফলে হেনরী বিরক্ত হয়ে পার্লামেণ্টে এক আইন পাস করে ইংলণ্ডের ধর্মীয় ক্ষেত্র থেকে পোপের কর্তৃত্বের অবসান ঘটালেন। অবশ্য ইংলণ্ডের জনগণও বহুদিন থেকেই ধর্মীয় জীবনে পোপের এই কর্তৃত্ব পছন্দ করছিল না। তাই যে কারণেই হোক হেনরী যখন সেই কর্তৃত্বের অবসান করতে উদ্যত হলেন, দেশের জনগণ তাঁকে সমর্থনই করেছিল।

ইংলণ্ড ও অষ্টম হেনরী

॥ ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ॥

ধর্মসংস্কার আন্দোলন নিঃসন্দেহে ক্যাথলিক ধর্মের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনাচার-

অবিচার লোক সমক্ষে প্রকাশ করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। স্বভাবতই তাই ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও ক্রমশ সংস্কারের দাবী প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। যাজক-সম্প্রদায় ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবন-যাপনের পরিবর্তে বিলাস-বহুল ভোগসর্বস্ব জীবনে যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তার বিরুদ্ধেই ছিল সবার বিক্ষোভ। সুতরাং দাবী উঠলো আত্মশুদ্ধির।

ক্যাথলিকদের আত্মশুদ্ধি

॥ জেসুইট সংঘ ॥

নানা দেশে ধীরে ধীরে ক্যাথলিক ধর্মীয় ব্যবস্থাকে পাপমুক্ত করার চেষ্টা আরম্ভ হল। এই সব চেষ্টা যাঁরা আরম্ভ করেন তাঁদের মধ্যে একটি স্মরণীয় নাম হল ইগ্নেশিয়াস লয়লা। তিনি জেসুইট সংঘ স্থাপন করে ক্যাথলিক ধর্মকে আবার জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি তাঁর সংঘের সভ্যদের তিনটি নীতি মেনে চলতে নির্দেশ দিলেন। এই নীতিগুলো হল, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য মেনে নেওয়া এবং সংঘের নির্দেশ সর্বতোভাবে মেনে চলা। পরে যখন জেসুইট সংঘ পোপের অনুমোদন লাভ করে তখন সংঘে আর একটি নীতি গৃহীত হয়। তা হল, পোপের আদেশ মান্য করা। জেসুইট সংঘের কাজ হল, শিক্ষার বিস্তার, অ-খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করা, ক্যাথলিক ধর্মত্যাগীদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা।

ইগ্নেশিয়াস লয়লা

সংঘের নীতি

অস্বীকার করা যায় না, জেসুইটদের চেষ্টার ফলেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের যে প্রসার হয়েছিল তা বন্ধ হয় এবং ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। শুধু ইউরোপেই নয়, অন্যান্য দেশেও শিক্ষার প্রসার ও ধর্মের প্রচারে তারা গিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাট আকবরের রাজসভাতেও দুজন জেসুইট এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

জেসুইটদের চেষ্টার ফল

॥ ট্রেণ্টের ধর্মসভা ॥

ট্রেণ্টের ধর্মসভার লক্ষ্য ছিল, ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কার সাধন করা। এই ধর্মসভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট পঞ্চম চার্লস। কিন্তু অনেকের আশা ছিল, এই সভার মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে একটা আপোষমীমাংসা হয়তো সম্ভব হবে। বাস্তবে তা না হলেও এই সভা ক্যাথলিক ধর্মের মূলনীতিগুলো স্থির করে দিয়েছিল, ক্যাথলিক যাজকদের নীতিজ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করেছিল এবং পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল।

ফলাফল

॥ ইনকুইজিশান ॥

ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইনকুইজিশান নামে এক ধর্মীয় আদালত ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এই আদালতে ক্যাথলিক ধর্মের বিদ্রোহীদের বিচার করা হত।

কিন্তু বিচারের নামে এই ব্যবস্থার সাহায্যে যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত তা বলবার নয়। আর বিচারের ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। অপরাধীকে নিজের কথা বলবার কোন সুযোগ দেওয়া হত না। আর দোষ প্রমাণিত হোক বা না হোক যাকে অপরাধী বলে মনে করা হত তাকে শাস্তি দেওয়া হতই। তাই ইনকুইজিশান কালক্রমে ধর্মের নামে নির্যাতনের প্রতীকে পরিণত হয়।

বিচারের ধরন

সুতরাং সচেতন যাজকসমাজ, জেসুইট সংঘ বা ট্রেণ্টের ধর্মসভার উদ্যোগে ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুত্থান যতটা সহজ হয়েছিল ইনকুইজিশান ততটাই ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধীদের চিরশত্রুতে পরিণত করেছিল।

প্রতিক্রিয়া

॥ স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ ও নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ॥

সব প্রধান কাজেই ব্যর্থতার হতাশায় আর নানা রোগের আক্রমণে বিপর্যস্ত পঞ্চম চার্লস শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় চার্লসের ভাই ফার্দিনান্দ জার্মানির এবং পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে বসেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ

স্পেন, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড ও আমেরিকা মিলে যে বিশাল সাম্রাজ্য ছিল ফিলিপের, সেখানে তিনি ছিলেন একচ্ছত্রাধিপতি। ফিলিপ নিজেও ছিলেন কঠোর একনায়কতন্ত্রী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর উগ্র একগুঁয়ে মনোভাব এবং ক্যাথলিক ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস। এই দুই মনোভাবই ছিল তাঁর ব্যর্থতার সব চেয়ে বড় কারণ। আর এই ব্যর্থতার একটি উদাহরণ হল নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ।

সে সময়ে সমগ্র ইউরোপে নেদারল্যাণ্ড ছিল একটি অন্যতম সমৃদ্ধশালী দেশ। দেশটি সতেরটি স্বাধীন প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। পঞ্চম চার্লস এই প্রদেশগুলোর ওপর আপন প্রভুত্ব স্থাপন করে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ফিলিপ যখন তাঁর শাসনকে আরও কঠোরভাবে ঐ দেশে প্রয়োগ করতে থাকেন তখন দেশবাসী তা মেনে নিতে পারে নি। তা ছাড়া তিনি অত্যন্ত নির্মমভাবে ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইনকুইজিশান ব্যবহার করলে দেশবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে ফিলিপ নানাভাবে

বিদ্রোহের কারণ

ঐ দেশ শোষণ করতে আরম্ভ করেন। যেমন, দেশের বিশেষ উন্নত তাঁতশিল্পের ওপর
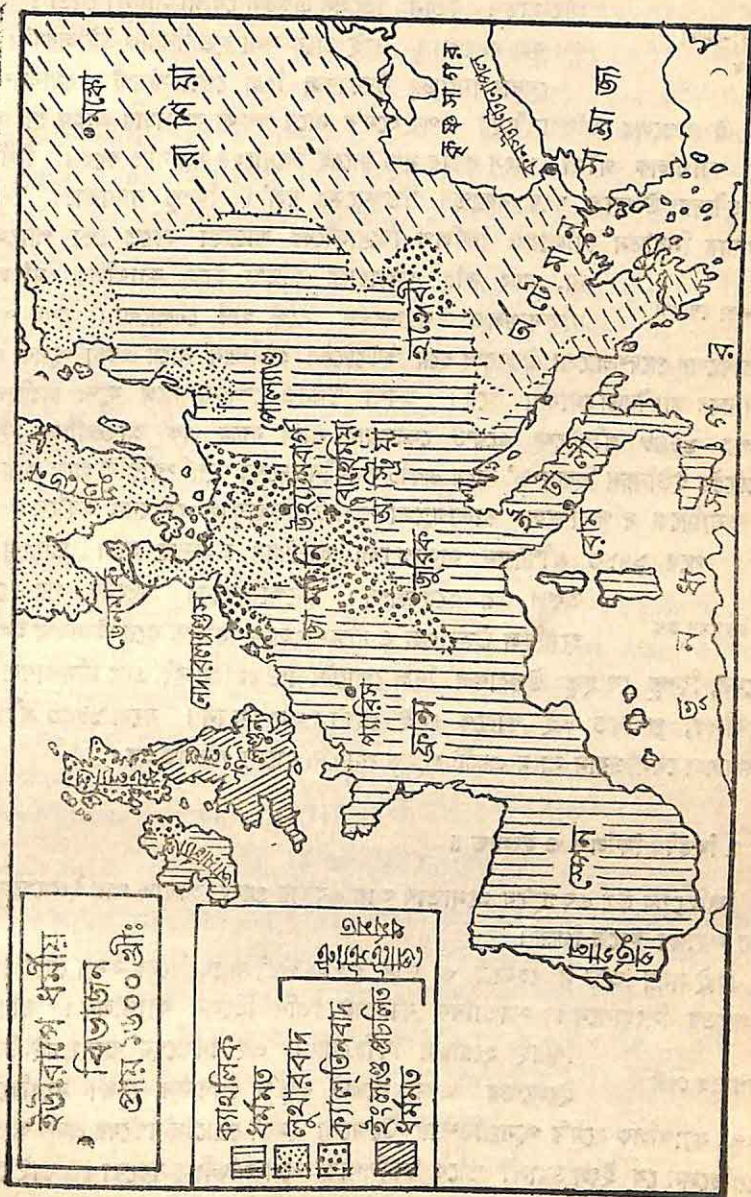
গুরুতর করভার আরোপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নানা বাধা-নিষেধ আরোপ। সুতরাং সবদিক মিলিয়েই নেদারল্যান্ডবাসীদের বিদ্রোহ ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

এই বিদ্রোহে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অরেঞ্জের উইলিয়ম নামে একজন অভিজাত। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সাহসী নেতা। কথা খুব কম বলতেন। তাই তাঁকে বলা হত 'নির্বাক উইলিয়ম'।

বিদ্রোহী-নেতা উইলিয়ম

নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী। যখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর ধর্মের নামে অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হয় তখন তারা ক্যাথলিক গীর্জা ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। ফিলিপ বিদ্রোহীদের উপহাস করে বলতেন 'ভিক্ষুকের দল'। কিন্তু নানাভাবে নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েও ফিলিপ বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে তো পারলেনই না, বরং তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দক্ষিণাঞ্চলও উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে হাত মেলালো। শেষ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ইউট্রেক্টের ইউনিয়ন' নামে একটা পৃথক রাজ্য গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অবশ্য তখনও স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিলই। তারপর ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ফেলিয়ার সন্ধি নামে এক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ইউট্রেক্টের ইউনিয়ন 'হল্যাণ্ড' নামে একটি স্বাধীন দেশের পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীনতা ঘোষণা

অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলো আরও কিছুকাল স্পেনের অধীনে থেকেই যায়। পরে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যগুলো অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ হয়। তারপর এই অঞ্চল জয় করে ফ্রান্স। নেপোলিয়নের পতনের পর চেষ্টা হয়েছিল উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলকে মিলিত করে ঐক্যবদ্ধ হল্যাণ্ড গঠনের, কিন্তু যেহেতু উত্তরাঞ্চল ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী এবং দক্ষিণাঞ্চল ছিল ক্যাথলিক, প্রধানত এই কারণে সেই চেষ্টা সফল হয় নি। ফলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চল বেলজিয়াম নামে একটি পৃথক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

বেলজিয়ামের জন্ম

॥ দ্বিতীয় ফিলিপ ও ইংলণ্ড ॥

ফিলিপের উগ্র একগুঁয়ে মনোভাব তার একবার প্রচণ্ড আঘাত পায় ইংলণ্ডের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে।

সেই সময় অষ্টম হেনরী ও তাঁর প্রথমা পত্নী ক্যাথারিনের কন্যা মেরী ছিলেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। স্বাভাবিক কারণেই তিনি ছিলেন ক্যাথলিক। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ফিলিপের। এই বিবাহের সুযোগেই ফিলিপ ইংলণ্ডের ওপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মেরী প্রোটেস্ট্যাণ্টদের এমন অত্যাচার করেছিলেন যে ইংলণ্ডবাসী তাঁকে 'রক্তপিপাসু' বলে অভিহিত করতো। তাই মেরীর সাহায্যে ফিলিপের আশা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

রক্তপিপাসু মেরী

যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যে নিঃসন্তান অবস্থায় মেরীর মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন

অষ্টম হেনরী ও অ্যান বলিনের কন্যা এলিজাবেথ। এলিজাবেথও স্বভাবতই ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী। ফিলিপ এবার এলিজাবেথকে বিবাহ করে ইংলন্ডে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আরেকবার উদ্যোগী হলেন। কিন্তু এলিজাবেথ এ বিবাহে সম্মত হলেন না। সুতরাং তিনি এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করতে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে গেলে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল ইংলন্ডবাসী এলিজাবেথের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। কারণ জনগণের কাছে ফিলিপের কার্যকলাপ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হল।

বিরোধের কারণ

সুতরাং এবার ব্যর্থ হয়ে ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিলিপের আরও রাগের কারণ হল এলিজাবেথ নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া ইংলণ্ডের সঙ্গে ছিল স্পেনের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতা। তাই ফিলিপ তাঁর দুর্ধর্ষ অজেয় নৌবহর পাঠালেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে।

স্পেনের নৌবহর যখন ইংলিশ চ্যানেলে গিয়ে পোঁছালো তখন অমিত বিক্রমে ইংলণ্ডের ছোট আকারের দ্রুতগামী যুদ্ধজাহাজগুলো আক্রমণ চালালো। অন্যদিকে সংকীর্ণ ইংলিশ চ্যানেলে বিশাল আকারের স্পেনের জাহাজ-গুলোর স্বাভাবিক নড়াচড়াতেই ছিল প্রচণ্ড অসুবিধে। ফলে মাত্র নয় দিনের যুদ্ধেই এতদিনের স্পেনের অপরাজেয় নৌবাহিনীকে পরাজয় মেনে নিতে হল। তাদের দুর্ভাগ্যও এমন, যুদ্ধশেষে অবশিষ্ট জাহাজগুলো যখন স্কটল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে দেশে ফিরছিল তখন এক সামুদ্রিক ঝড়ে বাকীগুলোও ধ্বংস হয়ে গেল।

স্পেনের পরাজয়

এইভাবে নৌশক্তিতে স্পেনের প্রবাদতুল্য শক্তি বিনষ্ট হল। পরিবর্তে জল-যুদ্ধে এক নতুন শক্তি হিসেবে ইংলণ্ডের আবির্ভাব হল। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী-স্পেনের হাত হতে অব্যাহতি পেল।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

যে ধর্মকে আশ্রয় করে মানুষ বেঁচে থাকতে চায় সেই ধর্মই যদি হয় অত্যাচারের হাতিয়ার, মানুষ তা কখনই মেনে নিতে পারে না। তাই ইউরোপে ঘটেছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলন। কিন্তু অত্যাচারীকে নিরস্ত করা সহজ কথা নয়। ইউরোপেও এ কাজ সহজে হয় নি। তার প্রমাণ ক্যাথলিক ধর্মকে একটু মুক্ত করার চেষ্টা, নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহ, স্পেনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। ক্যাথলিক ধর্ম সম্পর্কে মানুষ ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল কেন? মার্টিন লুথার প্রথম কিভাবে ও কিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান? এই প্রতিবাদের ফল কি হয়েছিল?

২। ধর্মসংস্কার আন্দোলন কিভাবে ক্যাথলিক ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল আলোচনা কর।

৩। নেদারল্যাণ্ডবাসীর বিদ্রোহের কারণ কি কি? তারা কখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে? শেষ পর্যন্ত কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করে?

৪। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফিলিপের যুদ্ধ ঘোষণার কারণ কি কি? অজেয় স্পেনীয় নৌবহর কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল?

॥ (খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন** ॥

১। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের শুকতারা কাকে বলা হয়? তাঁর বক্তব্য কি ছিল?

২। অগসবার্গের সন্ধিতে কি কি স্থির হয়েছিল?

৩। অষ্টম হেনরী পোপের বিরোধিতা করেছিলেন কেন?

৪। জেস্যুইট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই সংঘের মূলনীতিগুলো কি কি?

৫। বেলজিয়াম রাজ্যটির গঠন হল কিভাবে?

৬। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ

জন হাস, ইনডালজেন্স, ওয়ার্মসের সভা, ট্রেণ্টের সভা, ইনকুইজিশান।

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

(অ) ইনডালজেন্স আদালতে অপরাধীর পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ ছিল না।

(আ) ক্যালভিনের সমর্থকদের বলা হত লোলার্ড।

(ই) ওয়াইক্লিফ স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মকে শক্তিশালী করে তোলেন।

(ঈ) নেদারল্যাণ্ডে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলো নিয়ে গঠিত হল হল্যাণ্ড।

(উ) এলিজাবেথ ছিলেন অষ্টম হেনরী ও ক্যাথারিনের কন্যা।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) —আইন পড়া ছেড়ে সন্ন্যাসী হন।

(আ) স্পেনের নৌবহরের পরাজয়ে—এক নতুন নৌশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হল।

(ই) হল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন—।

(ঈ) মুঘল সম্রাট—রাজসভায় দুজন জেস্যুইট এসেছিলেন।

(উ) —ইংলণ্ডবাসী রক্তপিপাসু বলে।

৩। 'ক' স্তম্ভে দেওয়া পরিচয়গুলোর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে দেওয়া নামগুলো মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ) ক্যালভিনের সুযোগ্য শিষ্য	অ) বোহেমিয়া।
আ লুথারপন্থীদের বলা হয়	আ) হল্যাণ্ড।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ই) হল্যান্ডের বিদ্রোহীদের বলা হত	ই) প্রোটেস্ট্যাণ্ট ।
ঈ) ইউট্রেক্টের ইউনিয়নের বর্তমান	ঈ) জন নক্স ।
উ) ওয়াইক্লিফ যে দেশকে প্রভাবিত করেছিলেন ।	উ) ভিক্ষুকের দল ।

।। (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ।।

১। বিবাহের কারণে ধর্ম-বিরোধী হয়েছিলেন কোন রাজা ?
২। কি বিক্রি করে পোপ অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন ?
৩। স্পেন ও ইংলণ্ডের নৌ-যুদ্ধ হয়েছিল কোথায় ?
৪। জেসুইট সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেন ?
৫। অগ্‌সবার্গের সন্ধি হয়েছিল কবে ?
৬। কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে হল্যাণ্ড আইনত স্বীকৃতি পায় ?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন ঃ

(ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এই প্রসঙ্গে জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস ও মার্টিন লুথারের বাণী ও কর্মপদ্ধতি ।

(খ) ফলাফল—জার্মানির কয়েকটি রাজ্যে লুথেরান অথবা প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা—উত্তর ইউরোপ, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের প্রসার ।

(গ) ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতির প্রয়োজন—যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন—দমনমূলক নীতি প্রয়োগ এবং যাজকদের বিচার-সভায় (Inquisition Court) বিচারের দ্বারা প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মতবাদের উচ্ছেদ সাধন—জেসুইট সোসাইটি—কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট (১৫৪৫-১৫৬৩) ।

(২) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ—প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্য সমবায় বনাম সম্রাট পঞ্চম চার্লস (১৫৪৬-১৫৫৫)—অগ্‌সবার্গের সন্ধি ১৫৫৫ ।

(ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদ-সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা—তাঁর অপশাসন ও প্রজাদের ওপর অত্যধিক কর স্থাপনের ফলে উইলিয়ম অব্‌ অরেঞ্জের নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিদ্রোহ—উহার ফলাফল—১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং ডাচ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডে (অস্ট্রিয় নেদারল্যান্ড) বেলজিয়াম নামে পরিচিত হল (ক্যাথলিক রাজ্য) ।

(ঙ) প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য ফিলিপের প্রয়াস—স্প্যানিশ আর্মাডা—ফিলিপের ব্যর্থতা ।

———

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব

বিষয়-সংকেত

নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সজাগ সচেতনতা মানুষের জীবনে চলার পথে বড় পাথেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তার উৎস ঐ অধিকার বোধ থেকেই।

॥ টিউডর শাসনকাল ॥

রানী এলিজাবেথ যে বংশে জন্মেছিলেন সেই বংশের নাম টিউডর বংশ। টিউডর বংশের শাসনকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়েই এদেশে নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। স্পেনীয় নৌবহর ধ্বংস করে ইংলণ্ড এক উদীয়মান নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। দেশের ভেতর অনিশ্চয়তা ও সংকটের পরিবর্তে নিরাপত্তা স্থাপিত হয়েছিল।

ইংলণ্ডের সাফল্য

ইংলণ্ডের এই অভুতপূর্ব সাফল্যের পেছনে ছিল টিউডর রাজাদের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর সেই ভূমিকা পালনে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেমত এবং প্রয়োজনমত চলতেন। দেশের জনগণ ও তাঁদের এই শাসনপদ্ধতিকে মেনে নিয়েছিল। কারণ দেশের ভেতরে ও বাইরে তখন যে অবস্থা চলছিল তা থেকে অব্যাহতি পাবার এ ছাড়া বুঝি অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

টিউডরদের ভূমিকা

কিন্তু অবস্থার যখন পরিবর্তন হল, উন্নতি হল তখন আর দেশের মানুষ রাজাদের এমন অবাধ শাসনপদ্ধতি মেনে নিতে রাজী হল না। তারা দীর্ঘকাল লড়াই করে দেশের রাজাকেও একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে চালাবার যে অধিকার অর্জন করেছিল তা তারা এত আপোষে হারাতে চাইলো না।

জনগণের মনোভাব

॥ স্টুয়ার্ট রাজবংশ ॥

এমন এক পরিস্থিতিতেই ইংলণ্ডের ইতিহাসে আরম্ভ হল স্টুয়ার্টদের শাসনকাল, যার সূচনা করেন প্রথম জেম্‌স। জেম্‌স ছিলেন স্কটল্যাণ্ডবাসী। সেই হিসেবে তিনি হলেন ইংরেজদের চোখে বিদেশী। এর সঙ্গে যুক্ত হল স্টুয়ার্ট রাজাদের এক অন্ধ বিশ্বাস। জেম্‌স ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস বিশ্বাস করতেন রাজা ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করার অধিকার কারো নেই।

ষ্টুয়ার্টদের বিশ্বাস

অন্যদিকে জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেণ্ট রাজার এই অধিকারকে মেনে নিতে চাইলো না। বরং বললো, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজার কোন কর বসানো বে-আইনী, উপযুক্ত বিচার ছাড়া রাজার পক্ষে কাউকে শাস্তি দেওয়া অপরাধ। তা ছাড়া স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন ক্যাথলিক, পার্লামেণ্ট মেনে চলতো প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম।

পার্লামেণ্টের দাবী

প্রথম জেম্‌সের আমলে এই বিরোধ ভেতরে ভেতরে চললেও প্রথম চার্লসের সময়ে বিরোধ তীব্ররূপ ধারণ করলো।

॥ প্রথম চার্লস ও পার্লামেণ্ট ॥

চার্লসের শাসনকালে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটাবার তাগিদে চার্লস পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। পার্লামেণ্ট তার অর্থের প্রয়োজন মেটালো। কিন্তু বিনিময়ে চার্লসকে পার্লামেণ্টের অধিকারের আবেদন মেনে নিতে হল। ঐ আবেদন ছিল, রাজা পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কোন কর বসাবেন না, শান্তির সময়ে সামরিক আইন জারী করবেন না, বিচারে কাউকে বন্দী করবেন না ইত্যাদি।

অধিকারের আবেদন

কিন্তু এতে বিরোধের অবসান হল না। ফলে দীর্ঘ এগার বৎসর চার্লস দেশশাসন করলেন পার্লামেণ্ট ছাড়াই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের প্রয়োজনে আবার চার্লসকে পার্লামেণ্ট ডাকতে হয়।

এই পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলেছিল দীর্ঘ কুড়ি বৎসর। তাই এই অধিবেশনের নাম দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট। এবারও পার্লামেণ্ট রাজার অর্থের ব্যবস্থা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যারা দীর্ঘকাল পার্লামেণ্ট ছাড়া রাজাকে দেশশাসনে সাহায্য করেছিল তাদের বিচারের দাবী উঠলো। এটা চার্লসের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। রাজার পক্ষে যোগ দিলেন অভিজাত ও উচ্চপদস্থ যাজকগণ আর পার্লামেণ্টের পক্ষে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষ।

দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট

পার্লামেণ্ট বাহিনীর নায়ক ছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাজার পরাজয় ঘটে এবং ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে চার্লসের শিরশ্ছেদ করেন।

চার্লসের শিরশ্ছেদ

॥ ক্রমওয়েল ও প্রজাতন্ত্র ॥

চার্লসের পর ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। আর এই প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ক্রমওয়েল। কিন্তু তিনি যেভাবে সেনাবাহিনীর সাহায্যে নিজের ইচ্ছেমত দেশশাসন করেন তা দেশের লোকের ভাল লাগে নি। তারা তাই চাইছিল রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সেই সুযোগও এসে গেল।

ক্রমওয়েল

॥ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস। তিনি পার্লামেণ্টের সঙ্গে সহ-অবস্থানের পথই বেছে নেন।

কিন্তু তাঁর পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বকালে আবার নতুন করে বিরোধ দেখা দিল। কারণ জেম্‌স ছিলেন প্রথম চার্লসের মতই জেদী, ক্ষমতালোভী এবং গোঁড়া ক্যাথলিক। সুতরাং এমন রাজাকে পার্লামেণ্টের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তবু তারা শান্ত ছিল এ কারণে যে রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, ছিল এক কন্যা। কিন্তু শেষ বয়সে জেম্‌সের এক পুত্রের জন্ম হয়। ফলে সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে পার্লামেণ্ট।

দ্বিতীয় জেম্‌স

কিন্তু পার্লামেণ্টের এই সতর্কতায় ভয় পেয়ে যান দ্বিতীয় জেম্‌স। তিনি পালিয়ে গেলেন ফ্রান্সে। আর তাঁর পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসলেন তাঁরই কন্যা মেরী ও তাঁর স্বামী হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি তৃতীয় উইলিয়ম। ঘটনাটি ঘটলো ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং এতবড় একটি ঘটনা ঘটলো সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে। তাই একে বলা হয় 'গৌরবময় বিপ্লব'। আবার এমন ঘটনায় যেহেতু কোন রক্তপাত ঘটে নি সেহেতু এই বিপ্লবকে রক্তপাতহীন বিপ্লবও বলা হয়।

গৌরবময় বিপ্লব

মেরী ও উইলিয়ম উভয়েই ছিলেন গণতান্ত্রিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট। তবুও পার্লামেণ্ট একটি সুস্পষ্ট আইন রচনা করল। এই আইনকে বলা হয় অধিকারের বিধি। বিধিতে প্রজাদের বিভিন্ন অধিকার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হল। মেরী ও উইলিয়ম তা মেনেও নিলেন। ফলে ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা হয়ে গেল অনেক সীমাবদ্ধ আর দেশের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে অর্পিত হল পার্লামেণ্টের ওপর।

অধিকারের বিধি

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

দেশের প্রয়োজনে ইংলণ্ডবাসী টিউডরদের প্রাধান্য মেনে নিলেও স্টুয়ার্ট শাসনকালে পার্লামেণ্ট তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে শুরু হয় বিরোধ, বিরোধ থেকে গৃহযুদ্ধ। এই বিরোধেই এক রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়, অন্য রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স পালিয়ে যান। এরই ফলে ইংলণ্ডে রাজা থাকলেও প্রকৃত শাসনভার অর্পিত হয় পার্লামেণ্টের ওপর।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) **রচনামূলক প্রশ্ন** ॥

১। ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের কারণ কি কি? বিরোধে পার্লামেণ্টের নেতৃত্ব করেন কে? ফলাফল কি হয়েছিল?

॥ (খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন** ॥

১। দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট কেন বলা হয়? এই পার্লামেণ্ট কেন ডাকা হয়েছিল?

২। গৌরবময় বিপ্লব কি? এই বিপ্লবকে গৌরবময় বলা হয় কেন?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

অ) স্টুয়ার্ট রাজারা বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা—প্রেরিত প্রতিনিধি।

আ) — সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইচ্ছেমত দেশ চালাতেন।

ই) গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন —।

ঈ) — দ্বারা ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা অনেক কমে যায়।

উ) রানী মেরীর স্বামী ছিলেন —।

॥ ঘ) মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। অলিভার ক্রমওয়েলের শাসন দেশের লোক পছন্দ করে নি কেন?

২। গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কত খ্রীষ্টাব্দে?

৩। ইংলণ্ডের লোকেরা স্টুয়ার্ট রাজাদের বিদেশী বলে মনে করতো কেন?

৪। স্টুয়ার্ট রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

৫। পার্লামেণ্টের অধিকারের আবেদনে কি কি চাওয়া হয়েছিল?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব ঃ

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ—গৃহযুদ্ধ—ক্রমওয়েল এবং কমনওয়েলথ—স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব—বিল অব রাইটস্ (১৬৮৯) এবং অন্যান্য ফলাফল।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

ভারতবর্ষ

বিষয়-সংকেত

ইউরোপের ইতিহাসে যখন নবজাগরণ, ভারতের ইতিহাসেও তখন এক জাগরণ এসেছিল। তবে তা এসেছিল অন্যভাবে অন্যরূপে কিন্তু তার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। সেই জাগরণের কাহিনী-ই এবার আমাদের আলোচ্য।

॥ মুঘল যুগ ॥

ইউরোপের ইতিহাসে যখন নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন জনগণের মধ্যে এক চেতনার সৃষ্টি করছিল তখন ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। আর এই নতুন ধ্যান-ধারণা সৃষ্টিতে একটি রাজবংশের ছিল অসাধারণ ভূমিকা। সেই রাজবংশ হল মুঘল রাজবংশ।

বাবর

ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাবর, যাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল বিখ্যাত তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খাঁর শোণিত স্রোত। শৈশবেই নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পর শেষ পর্যন্ত তিনি ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে সেই সময়ের দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরের বৎসরই তিনি খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতে তাঁর ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

হুমায়ুন ও শেরশাহ

বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার মত সমর-কুশলী ছিলেন না। তাই তিনি বিহারের পাঠানবীর শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

শেরশাহের শাসনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র পাঁচ বৎসর। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশশাসনে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে যান।

শেরশাহের মৃত্যুর পর অবশ্য হুমায়ুন তাঁর হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের পর তিনি আর বেশীদিন বেঁচে থাকেন নি।

শেরশাহ আকবর

হুমায়ুনের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মহান আকবর। এ সময় দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান ঘটান আকবর দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) শেরশাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহ ও তাঁর মন্ত্রী হিমুকে পরাজিত করে। এরপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর আকবরকে রাজ্যজয়ে কাটাতে হয় এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা ছিল উত্তর-পশ্চিমে কাবুল, কান্দাহার ; দক্ষিণে আহমদনগর ; পূর্বে বঙ্গদেশ ও পশ্চিমে আরব সাগর। অনেক হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু কয়েকজন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন, গণ্ডোয়ানার রানী দুর্গাবতী, আহমদনগরের চাঁদবিবি ও মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ। আকবরও তাঁর অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারত জুড়ে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

আকবরের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর। নানা গুণের অধিকারী হলেও অতিরিক্ত সুরাসক্তি তাঁকে শাসনকার্যে তৎপর হতে দেয় নি।

জাহাঙ্গীরের পর তাঁর পুত্র শাহজাহানের শাসনকালে ভারতে স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছিল। ইতিহাসে তাই তিনি আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট হিসেবে পরিচিত। তাঁর শাসনকালেই নির্মিত হয় তাজমহল, আগ্রার দুর্গ, দিল্লীর লালকেল্লা, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি।

শাহজাহানের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্যের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু তিনি শাসনকার্যে

শাহজাহান

আওরঙ্গজেব

আকবরের অনুসৃত উদার নীতি ত্যাগ করেন। ফলে চারদিকে দেখা দেয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

বিশেষ করে আকবরের সময় থেকেই যে রাজপুত জাতি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি, তারা বিদ্রোহ করে। ধর্মীয় অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহ করে শিখজাতিও। তবে আওরঙ্গজেব ও মুঘল রাজবংশকে সর্বাধিক দুর্বল করে ফেলে শিবাজীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ মারাঠাজাতির আপোষহীন সংগ্রাম। আওরঙ্গজেব এই মারাঠাদের দমন করতে তো পারলেনই না, বরং তারা দাক্ষিণাত্যে পৃথক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল।

তাই বলা হয়, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হলেও এ সময় থেকেই সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়।

॥ আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ ॥

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তাঁর শাসনকাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের যে পতন আরম্ভ হয় তা তাঁর পরবর্তীকালের সম্রাটদের অযোগ্যতা এবং রাজপরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দ্রুততর হয়। আওরঙ্গজেবের পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ কেউই দীর্ঘকাল সিংহাসনে থাকেন নি। তদুপরি নানা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশ কমে আসতে থাকে। সাম্রাজ্যের এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে পারস্য-সম্রাট নাদিরশাহের আক্রমণ। অমানুষিক অত্যাচার এবং নির্বিচারে নরহত্যা করে তিনি দিল্লীকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করেন। এদেশ ত্যাগ কালে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান প্রচুর ধন-রত্ন, ময়ূর সিংহাসন ও বিখ্যাত কোহিনূর মণি।

নাদিরশাহের আক্রমণ

শেষের দিকে কেবলমাত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-ই দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তখন আর মুঘল সাম্রাজ্যের সেই গৌরব বা প্রতিপত্তি ছিল না। মারাঠাগণ

নাদিরশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

ক্রমশ তাদের প্রভাব দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। এ সময়ই আর এক আক্রমণকারী আফগানিস্থানের শাসক আহম্মদ শাহ আবদালী ভারত আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধই তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই আবদালীর হাতেই মারাঠাগণ পরাজিত হলে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ মুঘল সাম্রাজ্যে ইংরেজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদানের অপরাধে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করা হয় এবং শেষ হয় গৌরবোজ্জ্বল মুঘল শাসনকাল।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ

॥ মুঘল শাসন-ব্যবস্থা ॥

মুঘল শাসন-ব্যবস্থার সবার ওপরে ছিলেন সম্রাট নিজে। তাঁকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকত। কিন্তু মন্ত্রীদের কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ছিল কেবলমাত্র সম্রাটের।

সুশাসনের উদ্দেশ্যে বিশাল সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হত কতকগুলো সুবায়। সুবাগুলো আবার সরকারে এবং সরকার পরগণায় বিভক্ত ছিল। সুবার শাসনকর্তাকে বলা হত সুবাদার। প্রতি সুবায় রাজস্ববিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ছিল দেওয়ান।

সুবা

রাজস্ব-ব্যবস্থা

রাজস্ব-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আকবরের মন্ত্রী টোডরমলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সাম্রাজ্যের সকল জমি জরিপ করার ব্যবস্থা করেন। তারপর উৎপাদন অনুসারে জমিগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেন। সাধারণত উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে নেওয়া হত। এই ফসল টাকায় বা ফসলে দেওয়া যেত।

কাজী ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। প্রত্যেক সুবাতেও একজন করে কাজী

থাকতেন। প্রতি শহরের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়াল নামে এক কর্মচারীর ওপর। তা ছাড়া ছিল মুহ্‌তাসিব নামে এক ধরনের কর্মচারী। এদের কাজ ছিল দেশের লোক যেন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা।

বিচার ব্যবস্থা

মুঘল শাসনের শক্তির উৎসই ছিল সামরিক বাহিনী। তাই সামরিক বাহিনীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা রক্ষা করার দিকে সম্রাটরা ছিলেন বিশেষ সজাগ। আকবর এই যোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার এক নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এই ব্যবস্থার নাম মনসবদারী প্রথা। প্রত্যেক মনসবদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্যের যাবতীয় দায়িত্ব নিতে হত। বিনিময়ে রাজকোষ থেকে তাদের বেতন দানের ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বেতনের পরিবর্তে জমি দেওয়াও হত।

সামরিক ব্যবস্থা

॥ মুঘল যুগের সামাজিক জীবন ॥

মুঘল যুগের সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। স্বভাবতই সেই সমাজে অভিজাতদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরা বেহিসেবী আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেন। তবে তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে ভোগ করতে পারতেন না। কোন অভিজাতের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রথা ছিল। খুব সম্ভব এই কারণেই তাঁরা বেপরোয়া বেহিসেবী জীবন কাটাতেন।

অভিজাত

অভিজাতদের পরেই ছিল মধ্যবিত্তগণ। মধ্যবিত্ত বলতে বোঝাতো নিম্ন শ্রেণীর রাজ কর্মচারী, ছোট জমিদার, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন মিতব্যয়ী, কষ্টসহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী।

মধ্যবিত্ত

সমাজের একেবারে নিচুতলায় ছিল কৃষক, শ্রমিক, ছোট ছোট দোকানদার প্রভৃতি। এরা ছিল খুবই দরিদ্র। তখনকার দিনে জিনিস-পত্রের দাম খুব কম থাকায় কোন রকমে মোটা ভাত আর মোটা কাপড় এদের জুটতো। কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই সংগীন। তার ওপর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এদের কষ্টের সীমা থাকত না।

সাধারণ মানুষ

তখনকার হিন্দুসমাজে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাছাড়া কৌলিন্য প্রথাও ছিল। মুসলমান সমাজেও ছিল নানা সামাজিক প্রথা। উভয় সমাজেই ছিল নানা কুসংস্কার আর জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ বিশ্বাস।

সামাজিক প্রথা

॥ মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

মুঘল যুগে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা যেত প্রধান প্রধান শহরগুলোতে। শহরে বসবাস করতো প্রধানত অভিজাতরাই। তখনকার দিনের তুলনায় যাতায়াত ব্যবস্থাও খুব খারাপ ছিল না।

শহর

সে সময় তামার পয়সাকে বলা হত 'দাম'। দাম ছিল টাকার চল্লিশ ভাগের এক
মুদ্রা
ভাগ। টাকা ছিল রুপো দিয়ে তৈরী। জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। ধান, গম, ইক্ষু, তুলা, নীল প্রভৃতি ছিল কৃষিজাত পণ্য।
কৃষি
শিল্পের মধ্যে কাপড় বোনা ও পশম বস্ত্র ছিল প্রধান। বাংলা ও ওড়িশার তৈরী-কাপড় ছিল খুবই বিখ্যাত। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ছিল সারা
শিল্প
পৃথিবী জুড়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্থলপথে ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য হত। এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ মশলা বিদেশে
ব্যবসা
পাঠানো হত। কিছু সংখ্যক লোক ভোগে ও বিলাসে জীবন কাটালেও দেশের অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।
সাধারণ অবস্থা
কৃষক আর সাধারণ শ্রমিকদের জীবনে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির কোন উপায় ছিল না।

॥ মুঘল যুগে বিদেশী পর্যটকগণ ॥

ভৌগোলিক আবিষ্কারের নেশায় যখন ইউরোপের নানা দেশ নানাদিকে বেরিয়ে পড়েছিল তখনই তারা ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছিল। ভারতের ঐশ্বর্য বিদেশীদের নানাভাবে এদেশে আসতে প্রলুব্ধ করেছে। মুঘল শাসনকালেও কয়েকজন বিখ্যাত পর্যটকদের পরিচয় আমরা জানি। আকবরের রাজত্বকালে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্‌ নামে এক ইংরেজ পর্যটক এদেশে এসেছিলেন এবং আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি সম্পর্কে বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে এসেছিলেন স্যার টমাস রো, উইলিয়ম হকিন্স ও ফ্রান্‌সিস্‌কো। শাহজাহানের রাজত্বকালে এসেছিলেন তাভার্নিয়ে এবং আওরঙ্গজেবের সময় বার্নিয়ে। তাছাড়া মানুচি নামে এক ইটালীয় পরিব্রাজকও এসেছিলেন। এঁদের রচনায় মুঘল আড়ম্বরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজের নানা দুর্বলতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন এইসব পর্যটকগণ তাঁদের বিবরণীতে।

টমাস রো

॥ ইউরোপীয় বণিকদলের আগমন ॥

ভারতে আসার যে পথ আবিষ্কার করেন ভাস্কো-দা-গামা তা পরবর্তীকালে নানা ইউরোপীয় দেশকে এদেশে আসতে উৎসাহিত করেছিল। ভারতে প্রথম উপনিবেশ

স্থাপনকারী দেশ হল পর্তুগাল। এদেশে পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন আলবুকার্ক। কিন্তু ভারতবর্ষে পর্তুগীজ প্রাধান্য দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নি। তার কারণ তারা ভারতীয়দের জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল, বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধের অপব্যবহার করতো, এমন কি এদেশের মানুষের প্রতিও খুব দুর্ব্যবহার করতো। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে জলদস্যুতা আরম্ভ করে।

পর্তুগীজ

পর্তুগীজের পরেই যারা এদেশে আসে তারা হল ওলন্দাজ। তারা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানীও স্থাপন করে। তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে নেগাপত্তম ও পূর্বে চুঁচুড়া।

ওলন্দাজ

এরপর আসে ইংরেজরা। তারা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটা সংস্থা গড়ে তোলে। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে স্যার টমাস রোর চেষ্টায় ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। ক্রমশ সুরাট, মসুলিপত্তন, মাদ্রাজ, হুগলী, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে তারা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু কর দেওয়া নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হয় এবং তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের বাংলা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। এই সময়েই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক কলকাতা নগরের পত্তন করেন। এর আগেই তারা বোম্বাই ও মাদ্রাজের শাসন ক্ষমতা লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তৃত হতে লাগল।

ইংরেজ

ইংরেজদের মত ফরাসীরাও ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। কয়েক বছরের মধ্যে তারাও ভারতে সুরাট, মসুলিপত্তন, পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মাহে ও পূর্ব উপকূলে কারিকলে ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তারাও ভারতে এক শক্তিশালী বাণিজ্যিক সংস্থায় পরিণত হয়।

ফরাসী

এইভাবে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ হয় এবং এক গুরুতর রূপ ধারণ করে।

॥ মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার ॥

দক্ষিণ ভারতের এক পুরুষ-সিংহ বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা-তাপ্তী নদী দ্বারা পরিবৃত মহারাষ্ট্রের মারাঠীদের এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এই পুরুষ-সিংহ

হলেন ছত্রপতি শিবাজী। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার।

শিবাজী

তাঁর সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বপ্নের স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন।

কিন্তু শিবাজীর মৃতুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব দেখা দেয়। তা ছাড়া রাজ পরিবারেও আরম্ভ হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফলে, দ্বিতীয় শিবাজীর শাসনকালে পেশোয়া-তন্ত্রের সূচনা হয়। মারাঠা শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে বলা হত পেশোয়া। দ্বিতীয় শিবাজীর শাসনকাল থেকে পেশোয়া পদকে করা হল পুরুষানুক্রমিক এবং তারাই দেশের প্রকৃত শাসনকর্তায় পরিণত হলেন।

পেশোয়া পদ

দ্বিতীয় শিবাজীর রাজত্বকালে পেশোয়া ছিলেন বালাজী বিশ্বনাথ। তিনি তখনকার মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়রের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। চুক্তি দ্বারা শিবাজীর অধিকৃত যে সব স্থান মুঘলেরা দখল করে নিয়েছিল মারাঠারা তা ফিরে পেল। বিনিময়ে মারাঠাগণ মুঘল আনুগত্য মেনে নিল। এই চুক্তিতে শিবাজীর আদর্শের কিছুটা অমর্যাদা হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে মারাঠাদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল।

বালাজী বিশ্বনাথ

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও। বাজীরাও শিবাজীর মতই হিন্দু পাদশাহী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তাই তিনি জয়পুর, বুন্দেল প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি মালব ও গুজরাট জয় করেন এবং ক্রমশ দিল্লী পর্যন্ত নিজের প্রাধান্য বিস্তৃত করেন। এতে মুঘল সম্রাট মহাম্মদ শাহ ভয় পেয়ে হায়দরাবাদের নিজামের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু এই নিজামই বাজীরাও-র সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। এছাড়া তিনি পর্তুগীজদের কাছ থেকে সলসেট এবং বেসিনও উদ্ধার করেন। ফলে দক্ষিণ ও মধ্যভারত মিলে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মারাঠা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রথম বাজীরাও

বাজীরাও-র মৃত্যুর পর পেশোয়া হলেন তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও। তিনি তাঁর পিতার মত সুযোগ্য সেনানায়ক ছিলেন না। তিনি-ই সেনাবাহিনীতে ভাড়া করা সৈন্য নিয়ে আসেন। ফলে মারাঠা সেনাবাহিনীর সংহতি অনেকটাই নষ্ট হল। আর এই সেনাবাহিনী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ওপর জোর-জুলুম ও লুটতরাজ চালিয়ে এমনভাবে অর্থ সংগ্রহ করতো যে হিন্দুদের চোখে মারাঠাগণ যে সম্মান পেত তা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল।

বালাজী বাজীরাও

এসব সত্ত্বেও বালাজী বাজীরাও-র সময়েই মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। মহীশূরের একাংশে এবং কর্ণাটকে মারাঠা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হায়দরাবাদের নিজাম আরেকবার পরাজিত হলেন। বাংলার তখনকার নবাব আলীবর্দী খাঁ-ও মারাঠাদের কর দিতে বাধ্য হলেন। ওড়িশাও অধিকৃত হল। এইভাবে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের মুহূর্তে মারাঠাগণ ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

॥ শিখজাতির উত্থান ও তার সংগঠন ॥

গুরু নানক হলেন শিখধর্মের প্রবর্তক। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে জাতি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারাই হল শিখজাতি। পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর কূলে হল এদের বাসস্থান। নানকের পর বিভিন্ন শিখ গুরুর নেতৃত্বে শিখগণ ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে ছিল তাদের সম্প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু জাহাঙ্গীরের শাসনকাল থেকেই মুঘল-শিখ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তিনি শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দকে দীর্ঘকাল বন্দী করে রেখেছিলেন।

নানক ও পরবর্তী কাল

এই ঘটনা শিখজাতিকে এক সামরিক শক্তিতে পরিণত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শাহজাহানের এক সেনাবাহিনীকে অমৃতসরের কাছে এক যুদ্ধে পরাজিত করে শিখজাতি তাদের সামরিক শক্তির পরিচয় দেয়।

আওরঙ্গজেব শিখগুরু তেগবাহাদুরকে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ড শিখজাতিকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। তাই পরবর্তী গুরু গোবিন্দ শিখজাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে এক নতুন জাতি গঠনের কাজে অগ্রসর হন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে তিনি 'খালসা' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। খালসা শব্দের অর্থ পবিত্র সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়কে তিনি বীরত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তুলতে চাইলেন। এই সম্প্রদায়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, উচ্চ, নীচ কোন ব্যবধান থাকবে না। শিখজাতির প্রতীক হল কেশ, কঙ্কতী বা চিরুনি, কৃপাণ, কচ্ছ বা খাটো পায়জামা, এবং কড় বা লোহার বালা। গোবিন্দের নেতৃত্বেই শিখজাতি এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হল। মুঘলদের বিরুদ্ধে এবং আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিখজাতি তাদের সামরিক শক্তির যথার্থ পরিচয় রেখেছে। কিন্তু পৃথক স্বাধীন শিখ রাজ্য গঠনের যে স্বপ্ন ছিল গোবিন্দের তা তাঁর জীবতকালে সফল হয় নি। সেই স্বপ্ন সার্থক হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে।

তেগবাহাদুর

গুরু গোবিন্দ

॥ শিখজাতি ও রণজিৎ সিংহ ॥

মুঘল ও আফগানদের বিরুদ্ধে শিখজাতি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তারা তখনও এক সংঘবদ্ধ জাতি ছিল না। তারা ছিল কতকগুলো ছোট দলে বিভক্ত। এই দলগুলোকে বলা হয় মিস্‌ল। এই রকম একটি মিস্‌লের নাম স্কুর চাকিয়া। এইখানেই জন্ম হয় রণজিৎ সিংহের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

রণজিৎ সিংহ

কৈশোরেই তাঁকে মিস্‌লের দায়িত্ব নিতে হয় পিতার মৃত্যুতে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এক ঐক্যবদ্ধ শিখরাজ্য গঠন।

জামান শাহের আক্রমণ

আফগানিস্থানের শাসক জামান শাহ তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁর ওপর লাহোরের শাসনভার অর্পণ করেন। এরপর তিনি অমৃতসর, লুধিয়ানা জয় করে শতদ্রু নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন।

ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ

কিন্তু শতদ্রুর দক্ষিণে তিনি অগ্রসর হলে সেখানকার শিখ রাজ্যগুলো ভয় পেয়ে ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করে। ইংরেজরাও রণজিতের শক্তিতে বিচলিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ফরাসীদের ভারত আক্রমণ করার আশংকা ছিল, সেই হেতু তারা রণজিতকে শত্রুতে পরিণত করতে চাইল না। ফলে রণজিৎ ও ইংরেজদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো অমৃতসরের চুক্তি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে। স্থির হল, রণজিৎ শতদ্রুর পূর্বে আর রাজ্যসীমা বাড়াবার চেষ্টা করবেন না।

রাজ্যের সীমা

এবার তিনি মুলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার জয় করে এক বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান বীরের মৃত্যু হয়।

কৃতিত্ব

শুধু যোদ্ধা হিসেবেই নয়, শাসক হিসেবেও রণজিৎ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ, সেনা বাহিনীকে আরও দক্ষ করে তুলতে বিদেশী সেনানায়ক নিয়োগ, শাসনকার্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ না মানা তাঁর শাসনপ্রণালীর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে আপন শক্তিবলে তিনি যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন, তাই তাঁকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে।

● এই অধ্যায়ের মূল কথা ●

রাজনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জনে মুঘল যুগ ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। কিন্তু এই যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌরব-রবিও কিছুদিনের জন্য অস্তমিত হয়। সেই অন্ধকার দিনগুলোতে মারাঠা ও শিখজাতি কিছুক্ষণের জন্য আশার আলো জ্বালিয়েছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। মুঘল শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করো।

২। মুঘল সমাজব্যবস্থার গঠন কেমন ছিল? এই সমাজব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। মারাঠা শক্তির উত্থানে কার অবদান সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। কোন মুঘল সম্রাটকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়? কেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়?

২। কোন যুদ্ধকে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ বলা হয়? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

৩। কাকে পাঞ্জাব-কেশরী বলা হয়? তাঁর স্বপ্ন কি ছিল?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ
খালসা, সিসুল, শিখজাতির প্রতীক, অমৃতসরের সন্ধি, মনসবদার।

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

অ) বাবর ও সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ — যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আ) মাত্র পাঁচ বছর শাসন করেই বিখ্যাত হয়েছেন —।

ই) — রাজত্বকালে স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছিল।

ঈ) সামরিক বিভাগে আকবর — প্রথার প্রচলন করেন।

উ) বিদেশী পর্যটক — শাহজাহানের রাজত্বকালে এদেশে এসেছিলেন।

ঊ) — রণজিৎ সিংহকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন।

২। নীচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে ঠিক করে লেখ ঃ

অ) ভয় পেয়ে রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তি করেন।

আ) গুরু অর্জুনের নেতৃত্বে শিখগণ এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়।

ই) বাজীরাও সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য যোগাড় করে সেনাবাহিনীর ঐক্য নষ্ট করেন।

ঈ) আকবরের শাসনকালে বার্নিয়ে এদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন।

উ) মুঘলশাসনে সুবার শাসনকর্তাকে বলা হত দেওয়ান।

॥ (ঘ) মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার কারণ কি?
২। শেষ মুঘল সম্রাটের কি পরিণতি হয়েছিল?
৩। মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার বিখ্যাত মন্ত্রী কে ছিলেন?
৪। এদেশে পর্তুগীজ বাণিজ্য-সাফল্যে প্রধান ভূমিকা কে নিয়েছিলেন?
৫। কোন শিখগুরুকে হত্যা করেছিলেন আওরঙ্গজেব?

॥ (ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা ॥

১। পৃথক পৃথক মানচিত্রে নীচের বিষয়গুলো চিহ্নিত কর ঃ
ক) আকবরের সাম্রাজ্য।
খ) ইউরোপীয়দের বাণিজ্য কুঠি।
গ) রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্য।
২। মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনের ফটো সংগ্রহ কর।
৩। দিল্লী-আগ্রা বেড়িয়ে আসবার একটি ভ্রমণ-সূচী তৈরি করো।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ভারতবর্ষ ঃ

(ক) মুঘল সাম্রাজ্য—প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭)—মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন—কয়েকজন বৈদেশিক ভ্রমণকারীর নামোল্লেখ—সাম্রাজ্যের পতন—(১৭০৭—১৭৪৭)।

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

(i) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
(ii) মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার।
(iii) শিখজাতির উত্থান ও তাহার সংগঠন।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

বিষয়-সংকেত

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে পোহালে শর্বরী।' বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজরা কিভাবে ভারতের শাসকে পরিণত হল, এবারে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতের ধন-সম্পদের লোভে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল ইংরেজ ও
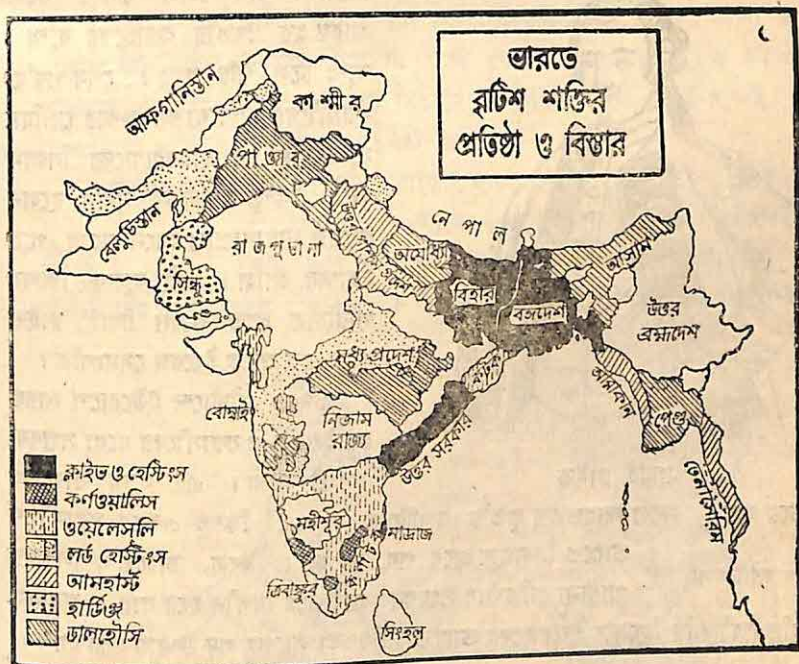
ফরাসীগণ। তারাও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত সফল হয় ইংরেজরা আর তার সঙ্গেই এদেশে ইংরেজদের ধারাবাহিক সাফল্যের সূচনা।

॥ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ॥

ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান ক্ষেত্র ছিল কর্ণাটক রাজ্য। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও ছিল নানা অরাজকতায় ভরা। তখন কর্ণাটকের নবাব আনোয়ার উদ্দীন। এই সময় ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে আরম্ভ হয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সূত্রেই ফরাসীরা ভারতে মাদ্রাজ দখল করে নেয়। নিরুপায় আনোয়ার চাইলেন ইংরেজ সাহায্য। আরম্ভ হল ফরাসীদের সঙ্গে আনোয়ারের যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত হল আনোয়ার উদ্দীন। এই যুদ্ধই প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ।

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজাম আসফঝার মৃত্যু হলে নিজামের পদ নিয়ে আসফের পুত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে কলহ শুরু হয়। আবার কর্ণাটকের নবাবের পদ নিয়েও বিবাদ আরম্ভ হয় আনোয়ার ও তাঁর জামাতা দোস্ত আলির মধ্যে। এই গণ্ডগোলে ইংরেজ ও ফরাসীরা দুই বিরোধী পক্ষে যোগ দেয়। ফলে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ। যুদ্ধ চলে পাঁচ বছর। শেষ পর্যন্ত ফরাসীদের সাহায্যে আসফঝার দৌহিত্র মুজাফ্ফর জং হায়দরাবাদের নিজাম হন। কিন্তু কর্ণাটকের নবাব হলেন ইংরেজ সাহায্যপ্রাপ্ত আনোয়ারের পুত্র মহাম্মদ আলি। এই যুদ্ধেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন রবার্ট ক্লাইভ নামে এক সুদক্ষ ইংরেজ সেনাপতি।

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ

রবার্ট ক্লাইভ

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে আরম্ভ হয় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ভারতেও ছড়িয়ে যায়। ফলে আরম্ভ হয় তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ। কিন্তু এবারে ফরাসীগণ ভারতে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। ফলে, ভারতে ফরাসীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা একেবারে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে ইংরেজদের ভারতে আধিপত্য লাভের পদ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ

॥ বঙ্গদেশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ॥

যখন দাক্ষিণাত্যে চলছিল ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব, তখন বাংলার নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ। তিনি দাক্ষিণাত্যের ঘটনাবলী দেখে কোন বিদেশীকে বাংলাদেশে দুর্গ নির্মাণ করতে অনুমতি দেন নি।

কিন্তু বাংলার পরবর্তী নবাব সিরাজউদৌলার সময় ইংরেজগণ কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে। ফলে সিরাজউদৌলা কলকাতা আবার জয় করলে উভয়ের মধ্যে আলিনগরের সন্ধি স্থাপিত হয়।

সিরাজউদৌলা

অবশ্য এই সন্ধি স্থায়ী হল না। কেননা ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ নবাবের নির্দেশ অমান্য করে ফরাসীদের কুঠি চন্দননগর দখল করেন। ফলে শুরু হল আবার উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য। অন্যদিকে সিরাজের গৃহশত্রুরও অভাব ছিল না। সেনাপতি মীরজাফর, রায়দুর্লভ এবং বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

পলাশীর যুদ্ধ

ক্লাইভ এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এঁদের নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে মীরজাফর ও রায়দুর্লভের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধই পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত, সংঘটিত হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

মীরজাফর

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার নবাব হন। কিন্তু দেশের প্রকৃত শাসক হল ইংরেজরা। নবাবের কিছুই করার ছিল না। হাতের পুতুল হয়ে থাকতে রাজী না হওয়ায় মীরজাফর চেষ্টা করেন নিজেকে ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে। ফলে তিনি নবাবের পদ থেকে অপসারিত হন।

মীরজাফর মীরকাশিম

পরবর্তী নবাব হলেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম। মীরকাশিম ছিলেন

দৃঢ়চেতা মানুষ। সুতরাং অচিরেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেঁধে গেল। বিরোধের প্রত্যক্ষ কারণ হল ইংরেজদের ব্যাপকহারে ব্যক্তিগত ব্যবসা, যার ফলে নবাবের রাজস্বের বিপুল ক্ষতি হল। তিনি এই ব্যবসা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতেই ইংরেজদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন অযোধ্যার নবাব এবং স্বয়ং মুঘল সম্রাট। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হল।

মীরকাশিম

এইবার আর বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে ইংরেজদের বাধা দেবার কেউ থাকল না। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে সুবা বাংলার দেওয়ানী লাভ করায় বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনগতভাবে ইংরেজরা লাভ করল।

দেওয়ান লাভ

॥ মারাঠা ও মহীশূরের সঙ্গে বিবাদ ॥

বাংলাদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হলেও তখন মারাঠা রাজ্য, নিজামের হায়দরাবাদ এবং হায়দর আলির মহীশূর রাজ্য ছিল বিশেষ শক্তিশালী। আর এঁদের পরাভূত করতে না পারলে সারা ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সহজ ছিল না।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস্। ভারতে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মারাঠাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় হেস্টিংস্ সম্রাটকে দেয়-বৃত্তি বন্ধ করে দেন এবং অযোধ্যার নবারের শক্তিবৃদ্ধি করতে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কোরা কেড়ে নিয়ে অযোধ্যার নবাবকে দেন। তা ছাড়া নবাবকে রোহিলাখণ্ড জয়ে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। রোহিলা অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে মারাঠাদের প্রাধান্য বিস্তারে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি হল। এইবার হেস্টিংস্ মারাঠা ও মহীশূরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস্

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর মারাঠাদের মধ্যে আরম্ভ হয় আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাদের নিজেদের মধ্যে আর বিন্দুমাত্র ঐক্য ছিল না। বরং পারস্পরিক বিবাদে ইংরেজদের সাহায্য নিতেও তারা দ্বিধা করত না। এই সময় যা কিছু সাফল্য তারা পেয়েছিল প্রধানত নানা ফড়নাবীশ ও মহাদাজী সিন্ধিয়ার নৈপুণ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এই দু'জনের মধ্যেও কোন সদ্ভাব ছিল না। ফলে তাঁরা কখনোই ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের উভয়েরই শত্রু

মারাঠা প্রতিরোধ

ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন নি। ফলে, শেষ পর্যন্ত তিনটি ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটে। আর মারাঠা শক্তির অবসানে ভারতে ইংরেজগণ এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে এক সুদৃঢ় সাম্রাজ্য গঠনের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

হায়দর ও টিপু

হায়দর আলি ছিলেন একজন সাহসী ও সুদক্ষ সেনাপতি। তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতান আজীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত চারটি ইঙ্গ-মহীশূর

হায়দর আলি

টিপু সুলতান

যুদ্ধের পর ইংরেজগণ আরেক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে রেহাই পেল। এইবার আর ভারতে তাদের বাধা দেবার মত কোন শক্তি রইল না।

॥ অধীনতামূলক মিত্রতা ॥

নীতির উদ্দেশ্য

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড ওয়েলেস্‌লি। তিনি লক্ষ্য করেন, ভারতের রাজারা নিজেদের বিবাদে প্রায়ই ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করে। এই মনোভাবকে কাজে লাগাতে ওয়েলেস্‌লি 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নামে এক নতুন নীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতি অনুসারে যদি কোন ভারতীয় রাজা ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন তাহলে ইংরেজগণ তাঁর রাজ্যকে বহিঃশত্রু ও অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। বিনিময়ে ঐ রাজাকে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে হবে এবং সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্য ইংরেজদের

নগদ টাকা বা রাজ্যের কিছু অংশ দিতে হবে। তা ছাড়া ঐ রাজা ইংরেজদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন বিদেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বা কোন বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন না। এই নতুন মিত্রতার চুক্তি প্রথম সম্পাদিত হয় হায়দরাবাদের নিজামের সঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে অযোধ্যার নবাব, মারাঠা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যও ঐ মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

এইভাবে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ইংরেজগণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

কিন্তু এতেও ইংরেজদের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা মেটে নি। লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে নেপাল পর্যন্ত ইংরেজ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এ সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল পিণ্ডারী দমন। পিণ্ডারী হল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত একদল দস্যু। এরা মধ্যভারত ও রাজপুতনা নিয়ে এক বিরাট এলাকা জুড়ে লুঠতরাজ করে বেড়াত। হেস্টিংস্ এদের কঠোরভাবে দমন করে রাজপুতনায় ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তৃত করেন।

পিণ্ডারী দমন

লর্ড আর্মহার্স্টের শাসনকালে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইবার ইংরেজদের নজরে আসে শিখরাজ্য। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখদের মধ্যে আর কোন যোগ্য নেতাও ছিল না। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ফলে পাঞ্জাবে শিখ অধিপতি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে ইংরেজ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর সমগ্র পাঞ্জাব ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

শিখরাজ্য জয়

॥ স্বত্ববিলোপ নীতি ॥

ওয়েলেসলি ও হেস্টিংসের মত ভারতে রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন লর্ড ডালহৌসী। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে বড়লাট হয়ে আসেন। পাঞ্জাব অধিকৃত হয় তাঁর সময়েই। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরেজগণ সাফল্য লাভ করে তাঁর নেতৃত্বেই। সিকিম রাজ্যের একাংশও তিনি দখল করেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার মেটাতে না পারায় তিনি বেরার প্রদেশটি অধিকার করেন।

ডালহৌসীর এই যে রাজ্যজয়ের ক্ষুধা তা মেটাতে তিনি 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রবর্তন করেন। এই নীতির মূলকথা হল, ইংরেজ আশ্রিত কোন রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ঐ রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কোন রাজা দত্তকপুত্র নিতে চাইলে তাঁকে আগেই ইংরেজদের অনুমতি নিতে হবে। এই নীতি প্রয়োগ করেই ডালহৌসী সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর,

নীতির উদ্দেশ্য

সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য দখল করেন। তা ছাড়া কুশাসনের অভিযোগে ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্যটিও অধিকার করে নেন।

সুতরাং দেখা গেল, বল প্রয়োগ করে অথবা নানা কৌশল অবলম্বন করে ডালহৌসী ইংরেজ সাম্রাজ্যকে আরও বেশী সম্প্রসারিত করেছিলেন। কিন্তু এই যে নানা ছলা-কলা-কৌশল অবলম্বন করা তার প্রতিক্রিয়া ঘটতেও সময় লাগে নি। কেন না সব কিছু মেনে নেবারও একটা সীমা থাকে। সেই সীমা পেরিয়ে গেলেই প্রতিক্রিয়া ঘটাই স্বাভাবিক।

নীতির ফলাফল

॥ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ॥

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর শাসনকালেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু ভারতবাসীর মনে নানা কারণেই বহু বিক্ষোভ বহুকাল ধরেই সঞ্চিত হচ্ছিল। এই সব সঞ্চিত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে।

॥ বিদ্রোহের কারণ ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের কারণগুলোকে আমরা কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। তার মধ্যে প্রথমেই আসে রাজনৈতিক কারণ।

রাজনৈতিক কারণ ঃ প্রথমত, ইংরেজদের আগে যে সব বিদেশীরা এদেশ জয় করেছিল তারা ধীরে ধীরে ক্রমশ এদেশের সঙ্গে মিশে যায়; যেমন মুঘল শাসকেরা। কিন্তু ইংরেজরা কখনোই এদেশের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারে নি। বরং তাদের শাসনপদ্ধতি পরিচালিত হত সাগর পারে নিজেদের দেশের স্বার্থেই। তার ফলে ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল।

বিদেশী শাসন

দ্বিতীয়, লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতির যথেচ্ছ প্রয়োগ ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে এক দারুণ আতংকের সৃষ্টি করেছিল। অকারণ অজুহাতে ইংরেজদের নগ্ন পররাজ্যগ্রাসী মনোভাব স্বভাবতই তারা ইংরেজ শাসনের বিরোধীতে পরিণত হয়।

স্বত্ববিলোপ নীতি

অর্থনৈতিক কারণ ঃ প্রথমত, দেশীয় রাজাদের শাসনে দেশের জ্ঞানী-গুণী, সাধারণ লোক নানাভাবে সমাদর লাভ করতো। কিন্তু এখন শাসকের পরিবর্তন হওয়ায় এই সব লোকেরা অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুর্গতিতে পড়ে যায়।

শাসক পরিবর্তনের ফল

দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা এদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন আনে তার ফলে জমিদার ও কৃষক উভয়েই অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তাদের ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

ভূমিরাজস্বে পরিবর্তন

তৃতীয়ত, এদেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের বাজার বিদেশী পণ্যদ্রব্যে ভর্তি হয়ে যায়। ঐ সব জিনিস যন্ত্রে তৈরী হত বলে দামেও ছিল সস্তা। ফলে ভারতের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

বিদেশী পণ্য

সামাজিক কারণ ঃ প্রথমত, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করেছিল ইংরেজরাই। কিন্তু দেশের প্রাচীনপন্থী যারা, তারা এই শিক্ষাকে মেনে নিতে পারে নি। তাদের আশংকা ছিল এই বিদেশী শিক্ষা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবে। ফলে তারা ছিল অসন্তুষ্ট।

পাশ্চাত্য শিক্ষা

দ্বিতীয়ত, সতীদাহ রোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে ইংরেজ শাসকগণ বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় দেশের লোকের মনোভাব ইংরেজ শাসন সম্পর্কে অধিকতর বিরূপ হয়ে ওঠে।

সামাজিক প্রথা রদ

তৃতীয়ত, দেশে রেলপথ স্থাপন, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি কাজগুলোও এদেশের মানুষ তাদের ধর্মনাশে ইংরেজদের চক্রান্ত বলেই মনে করতো।

উন্নয়নমূলক কাজ

প্রচলিত বিশ্বাস ঃ বিদ্রোহের সময় দুটি বিশ্বাস ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় যথেষ্ট উদ্দীপনার কাজ করেছিল। প্রথমটি হল, ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এই দুর্বলতা বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর দ্বিতীয়টি হল, এদেশবাসীর বিশ্বাস ছিল, ইংরেজ শাসন কিছুতেই একশ বছরের বেশী এদেশে টিকবে না। এই হিসেবে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বছর থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই একশ বছর পূর্ণ হয়। সুতরাং সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে এইবার ইংরেজ শাসনের অবসান আসন্ন।

ক্রমিয়ার যুদ্ধ

সামরিক কারণ ঃ প্রথমত, যে সব ভারতীয়গণ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তারা ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় সুযোগ-সুবিধে, বেতন যথেষ্ট কম পেত। স্বভাবতই এতে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ যথেষ্টই আহত হত।

মর্যাদাহীন ভারতীয় সৈন্য

দ্বিতীয়ত, বিদেশে যুদ্ধ করতে অনেক সময় ভারতীয় সৈন্যদের পাঠানো হত। কিন্তু এতেও হিন্দু সৈন্যদের মনে ধর্মনষ্ট হবার আশংকায় তারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল।

বিদেশে ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণ

তৃতীয়ত, এনফিল্ড নামে এক নতুন ধরনের রাইফেলের প্রচলন বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে অগ্নিশলাকার কাজ করেছিল। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে রাইফেলে ভরতে হত। গুজব রটে যায় ঐ টোটায় গরু ও শুকরের চর্বি মাখানো থাকে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়

এনফিল্ড রাইফেল

সম্প্রদায়ের সৈন্যরাই ধর্মনষ্ট হবার আশংকায় ঐ রাইফেল ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলো।

॥ বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ॥

বাংলাদেশের ব্যারাকপুরেই প্রথম বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহের নেতা মঙ্গল পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এরপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে যায় আম্বালা ও মীরাটে। মীরাটের

তাঁতিয়া তোপী

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ

সৈন্যরা দিল্লী দখল করে বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ক্রমশ বিদ্রোহ ছড়িয়ে যায় অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ্মৌ, বেরিলি, ঝাঁসী প্রভৃতি অঞ্চলে। বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন কানপুরে নানা সাহেব, ঝাঁসীতে রানী লক্ষ্মীবাঈ, মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতি। এক বৎসরের কিছু বেশী এই বিদ্রোহ চললেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

॥ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ॥

গণ-সমর্থনের অভাব

প্রথমত, ভারতের বিরাট এলাকা জুড়ে বিদ্রোহ বিস্তৃত হলেও বিদ্রোহের পেছনে সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন ছিল না। শিক্ষিত ভারতীয়গণ ছিলেন ইংরেজ সমর্থক। বহু দেশীয় রাজা ইংরেজ পক্ষই সমর্থন করেছিল। শিখরা বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

লক্ষ্য ও কর্মে অমিল

দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ও কর্মধারায় কোন মিল ছিল না। তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগেরও ছিল যথেষ্ট অভাব। তৃতীয়ত,

দুর্বল বিদ্রোহীর শক্তি

সামরিক শক্তির বিচারেও বিদ্রোহীরা ছিল ইংরেজদের তুলনায় অনেক দুর্বল।

চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উপযুক্ত নেতারও অভাব ছিল। তাদের এমন নেতা ছিল না যে বুদ্ধিতে, কৌশলে, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতায় বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ রাখার নৈপুণ্যে ইংরেজদের তুলনায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে।

নেতার অভাব

॥ বিদ্রোহের প্রকৃতি ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ নিয়ে নানা ঐতিহাসিকদের নানা রকম মতভেদ। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে চান নি। আবার কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত যেমন বীর সাভারকার এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার মনে করেন বিদ্রোহ প্রধানত সিপাহীদের হলেও কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপলাভ করেছিল। অন্যদিকে ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন, বিদ্রোহ সিপাহীদের হলেও পেছনে ছিল অসংখ্য মানুষের সঞ্চিত বিক্ষোভ ও অভিযোগ।

বিভিন্ন মত

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে আজকের দিনে স্বাধীনতা লাভ বলতে আমরা যা বুঝি, তখনকার দিনে সে রকম ধারণা করা সম্ভব ছিল না। তবে সে দিনের মানুষ যে ইংরেজ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তার অবসান চেয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ ইংরেজ শাসনের ফলাফল ॥

ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ ইংরেজ শাসনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে। এই অধ্যায়ে স্পষ্ট ধরা যায় ইংরেজ শাসনের কি প্রভাব এদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পড়েছিল।

একথা ঠিক, ইংরেজ শাসনাধীনেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে একই শাসন কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। তা করতে গিয়ে এদেশের বহু পরিচিত ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দিয়ে ইংরেজরা এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। এতদিন যারা ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে তারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়াতে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হল। বাংলাদেশে মহারাজ নন্দকুমারের পণ্ডীচেরীর ফরাসী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব ওয়াজির আলির বিদ্রোহ এই বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শোষণের এক মুক্ত অঞ্চল বলে গ্রহণ করেছিল। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-ই নয়, কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সুবাদে যে অবাধ লুণ্ঠন চালিয়েছিল তা ইতিহাসের এক কলংক। ইংরেজ শাসনে প্রকৃতপক্ষে এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল। বিভিন্ন আদিবাসীদের বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ,

অর্থনৈতিক শোষণ

ওয়াহাবি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনাবলী ঐ শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ও তীক্ষ্ন প্রতিক্রিয়া।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

ছলে-বলে-কৌশলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে নজীর ইংরেজরা তৈরি করেছিল পলাশীর প্রান্তরে তা আরও নগ্নরূপ ধারণ করে ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা এবং ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতির মধ্য দিয়ে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করেছিল ইংরেজরা। এই সব ঘটনারই পরিণতি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। দক্ষিণ ভারতে কিভাবে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল? এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি কি হয়েছিল?

২। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কি কি? পলাশীর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কি বোঝ? এই নীতি কিভাবে প্রয়োগ হয়েছিল? তার ফলাফল কি হয়েছিল?

৪। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলো আলোচনা কর। এই বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:
বক্সারের যুদ্ধ, হায়দর আলি, অধীনতামূলক মিত্রতা, মঙ্গল পাণ্ডে, পিণ্ডারী।

২। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ-সম্পর্কে কি বলেছেন?

৩। ডালহৌসীর নানাভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফল কি হয়েছিল?

৪। ইংরেজ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন হয়েছিল?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। 'ক' স্তম্ভে লিখিত ঘটনাগুলোর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে লিখিত নামগুলো মেলাও:

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
(অ) অধীনতামূলক মিত্রতা	(অ) টিপু সুলতান
(আ) স্বত্ববিলোপ নীতি	(আ) মীরজাফর

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
(ই) পিণ্ডারী দমন	(ই) ওয়েলেস্‌লি
(ঈ) পলাশীর যুদ্ধ	(ঈ) ডালহৌসী
(উ) ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্ব	(উ) হেস্টিংস

২। নিচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ

(অ) বীর সাভারকার বলেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে সিপাহীদের বিদ্রোহ। (আ) সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করলে তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের আলিনগরের সন্ধি স্থাপিত হয়। (ই) প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুগে পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। (ঈ) ডালহৌসী কুশাসনের অভিযোগে নাগপুর দখল করেন।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) ইংরেজ — খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে।

(আ) দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে অধীনতামূলক মিত্রতায় প্রথম আবদ্ধ হয়— ।

(ই) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে — ।

(ঈ) পলাশীর যুদ্ধে কৌশলী ইংরেজ সেনাপতি হলেন — ।

(উ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে প্রথম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন — ।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। কত খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয় ?

২। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন কাঁরা ?

৩। কত খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানী লাভ করে ?

৪। পিণ্ডারী বলতে কাদের বোঝায় ?

৫। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিখ্যাত এক বীরাঙ্গনার নাম বল।

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা** ॥

১। একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র এঁকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো নির্দেশ কর।

২। নিচের বিষয়টির ও শ্রেণীকক্ষে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন কর।

"সভার মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।"

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

(ক) প্রথম স্তর — ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

(খ) পরবর্তী স্তর — ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

(গ) সিপাহী বিদ্রোহ—কারণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ

(ঘ) বৃটিশ শাসনের ফলাফল—রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অসন্তোষ (সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত)

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী

বিষয়-সংকেত

নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম। এমনই তিনটি সংগ্রাম মানব সভ্যতার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই তিন সংগ্রাম কাহিনী এবার আমরা জানবো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন তিনটি ঘটনা ঘটে গেল, যা মানুষের সভ্যতাকে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। ঘটনাগুলো হল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব।

॥ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥

উপনিবেশের মনোভাব

সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু ইংরেজ নানা কারণে মাতৃভূমি ত্যাগ করে আমেরিকায় বসবাস করতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের মত উপনিবেশ গড়ে তোলে। তারা নিজেদের মত আইন-কানুন তৈরী করে নিজেদের শাসন করতো। তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে ইংলণ্ডের খবরদারী পছন্দ করতো না। কারণ একদিন তো তারা বীতশ্রদ্ধ হয়েই মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বভাবতই মাতৃভূমি সম্পর্কে তাদের মনোভাব তাই খুব প্রসন্ন ছিল না।

॥ যুদ্ধের কারণ ॥

ফরাসী উপনিবেশের অবসান

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ অবস্থার পরিবর্তন হল। এক সময় সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমেরিকাতে ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ আর আমেরিকার পাশেই কানাডায় ছিল ফরাসীদের উপনিবেশ। তাই ফরাসী আক্রমণের আশংকা থেকে আমেরিকাকে রক্ষা করতে ইংলণ্ডকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হত। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড কানাডার ফরাসী উপনিবেশগুলো জয় করে। এইবার ইংলণ্ড এই ব্যয়ভারের খানিকটা আমেরিকার উপনিবেশগুলোর ওপর চাপাতে চাইলো। অন্যদিকে উপনিবেশগুলোও ফরাসী আক্রমণের আশংকা না থাকাতে আর ইংরেজ প্রভুত্ব মেনে নিতে চাইলো না।

স্ট্যাম্প আইন

এই অবস্থায় ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড উপনিবেশগুলোর ওপর স্ট্যাম্প আইন নামে এক ধরনের কর বসাতে উদ্যোগী হল। কিন্তু উপনিবেশগুলো যেহেতু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই সেহেতু তাদের ওপর পার্লামেণ্টের কোন কর বসাবার অধিকার নেই—এই যুক্তিতে স্ট্যাম্প আইন অগ্রাহ্য করলো। আরম্ভ হল আন্দোলন।

আন্দোলনের চাপে স্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহার করে নিলেও সীসা, কাচ, চা প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর ইংলণ্ড আমদানি কর বসাল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা বোস্টন বন্দরে জাহাজ ভর্তি চায়ের বাক্সগুলো জলে ফেলে দিল।

বোষ্টনের ঘটনা

জর্জ ওয়াশিংটন

এই ঘটনাতেই আগুন জ্বলে উঠল। ইংলণ্ড উপনিবেশগুলোকে শায়েস্তা করতে আমেরিকাতে সৈন্য পাঠালো। অন্য দিকে উপনিবেশগুলো ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত-ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। উপনিবেশ-গুলোকে নেতৃত্ব দিলেন জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক সমরকুশল সেনাপতি।

শেষ পর্যন্ত ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে ইংলণ্ড পরাজিত হল এবং তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। আর উপনিবেশগুলো মিলিত হয়ে আমেরিকা মহারাষ্ট্র নামে এক নতুন রাষ্ট্র গঠন করলো। নব গঠিত রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

ইংলণ্ডের পরাজয়

॥ স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ॥

প্রথমত, আমেরিকার সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে ইংলণ্ড তার উপনিবেশগুলো সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। জোর করে যে কারো আনুগত্য আদায় করা যায় না এই শিক্ষা সে দেশ পেল।

দ্বিতীয়ত, এই সংগ্রামে ফরাসীগণ উপনিবেশগুলোকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের দেশে এক বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে তুললো। একদিকে শূন্য রাজ-কোষ, অন্যদিকে মানুষের মর্যাদার লড়াই ফরাসীদের মধ্যে নিজ দেশে বিপ্লব ঘটাতে উৎসাহ যোগালো আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ফরাসী বিপ্লবে ইন্ধন

তৃতীয়ত, এই সংগ্রাম হল্যাণ্ডের ইতিহাসেও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলো। সেখানকার জাতীয়তাবোধ জাগরণে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল।

হল্যাণ্ড

॥ ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ ॥

অমিত শক্তিশালী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলোর সাফল্য বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক নয়। কারণ,

মতবিরোধ

প্রথমত, ইংরেজদের নিজেদের মধ্যেই আমেরিকা সংক্রান্ত নীতি নিয়ে মতবিরোধ ছিল। যুদ্ধ পরিচালনাতেও তারা অনেক ভুল করেছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার
কা না ডা
ওয়াশিংটন ১৮৮৯
মণ্ট্যানা ১৮৮৯
উত্তর ডাকোটা ১৮৮৯
মিনেসোটা ১৮৫৮
ওরিগন ১৮৫৯
আইডাহো ১৮৯০
ওয়াইওমিং ১৮৯০
দক্ষিণ ডাকোটা ১৮৮৯
উইসকনসিন ১৮৪৮
নেভাদা ১৮৬৪
ইউটা ১৮৯৬
নেব্রাস্কা ১৮৬৭
আয়োয়া ১৮৪৬
ইলিনয় ১৮১৮
ওহিও ১৮০৩
কলোরাডো ১৮৭৬
কানসাস ১৮৬১
মিসৌরী ১৮২১
কেনটাকী ১৭৯২
টেনেসী ১৭৯৬
আরিজোনা ১৯১২
নিউ মেক্সিকো ১৯১২
ওকলাহোমা ১৯০৭
আরকানসাস ১৮৩৬
আলাবামা ১৮১৯
টেক্সাস ১৮৪৫
ফ্লোরিডা ১৮৪৫
মেইন
নিউইয়র্ক
জর্জিয়া
কালিফোর্নিয়া ১৮৫০
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
মেক্সিকো উপসাগর
মে ক্সি কো
১. নিউ হ্যাম্পশায়ার ২. ম্যাসাচুসেটস্
৩. রোড দ্বীপ ৪. কনেকটিকাট
৫. নিউ জার্সি ৬. ডেলাওয়ার ৭. মেরীল্যাণ্ড
প্রথম তেরটি উপনিবেশ

দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের সামরিক নৈপুণ্য ও সাহায্য ঔপনিবেশিকদের সাফল্য লাভে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

ফরাসী সাহায্য

জর্জ ওয়াশিংটন

তৃতীয়ত, জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব ঔপনিবেশিকদের এক গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর সেই নেতৃত্বও ছিল বলিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য।

দূরত্ব

চতুর্থত, ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দূরত্ব উপনিবেশগুলোকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল।

॥ শিল্প-বিপ্লব ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমে ইংলণ্ড, পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে মানুষের জীবনযাত্রার এক বিরাট পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের মূল কথা হল বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দেওয়া। যন্ত্রের সাহায্যে পরিবর্তন এসেছিল বলে এই পরিবর্তনকে বলা হয় শিল্প-বিপ্লব।

বিপ্লবের অর্থ

নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হবার এবং নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ফলে, নানা শিল্প-সামগ্রীর চাহিদাও বেড়ে যায়। তখন কাঁচামালের অভাব ছিল না। প্রয়োজন ছিল চাহিদা অনুপাতে দ্রুত সামগ্রী উৎপাদন। তাই মানুষের চেষ্টা আরম্ভ হল নতুন নতুন নানা ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কারের যেন প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন বাড়ানো যায়।

বিপ্লবের কারণ

॥ শিল্পে পরিবর্তন ॥

শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব প্রথমেই লক্ষ্য করা গেল বয়ন শিল্পে। অল্প সময়ে বেশী পরিমাণ কাপড় তৈরী করার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হল। এই শিল্পের উন্নতিতে হারগ্রীভ্‌স, কে. ক্রমপ্‌টন, হুইট্‌নি, কার্টরাইট, আর্করাইট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের নাম স্মরণীয়।

বয়ন শিল্প

আবার যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য চাই লোহা। কিন্তু লোহাকে ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে দরকার কয়লা। তাই খনি থেকে নিরাপদে বেশী পরিমাণে কয়লা সংগ্রহের জন্য আবিষ্কৃত হল সেফ্‌টি ল্যাম্প, ব্ল্যাস্ট ফারনেস। অধিক পরিমাণে কয়লা পাওয়ার সুবিধে হওয়াতে লৌহ শিল্পেরও প্রসার ঘটে।

লৌহ শিল্প

॥ কৃষিতে পরিবর্তন ॥

শিল্পের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এল কৃষিক্ষেত্রেও। দেখা গেল, এক জমিতে একই ফসল বার বার উৎপাদন করলে উৎপাদন কমে যায়। তাই আরম্ভ হল ভিন্ন ফসলের চাষ। সার ও ভাল বীজের ব্যবহার কৌশল মানুষ আয়ত্ত করে ফেললো এবং কৃষিতে ব্যবহারের উপযোগী নানা যন্ত্রও আবিষ্কৃত হল।

উৎপাদনের পরিবর্তন

॥ পরিবহনে পরিবর্তন ॥

শুধু উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, প্রয়োজন হল দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে সামগ্রী পাঠাবার ব্যবস্থা। এর জন্য চাই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই আরম্ভ হল নদীর ওপর লোহার সেতু নির্মাণ, পাথর দিয়ে মজবুত করে রাস্তা তৈরী, জলসেচের জন্য খাল খনন। স্টিভেনসন আবিষ্কার করলেন রেলইঞ্জিন। তৈরী হল জাহাজ। অল্পদিনের মধ্যে মানুষ বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারও আয়ত্ত করে ফেললো। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ, নিরাপদ এবং দ্রুত হয়ে গেল।

স্টিভেনসন আবিষ্কৃত রেলইঞ্জিন

॥ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ॥

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় এল এক বিরাট পরিবর্তন। ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও বেশী প্রসার সম্ভব হল।

এই বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল, কারখানা ব্যবস্থার প্রচলন। বেশী পরিমাণে উৎপাদনের প্রয়োজনে গড়ে উঠলো বড় বড় কল-কারখানা। এই কারখানা-ব্যবস্থা প্রচলনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।
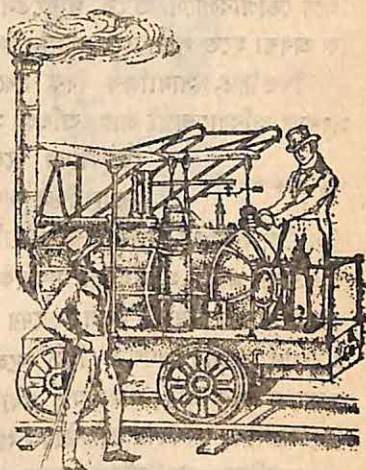
প্রথমত, এই ব্যবস্থায় পৃথিবী শিল্পে উন্নত দেশ এবং শিল্পে অনুন্নত দেশ এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

বিভক্ত পৃথিবী

দ্বিতীয়ত, এতদিন সভ্যতা ছিল গ্রামপ্রধান। এখন হল শহরকেন্দ্রিক। স্বাধীন শ্রমজীবী মানুষ এখন পরিণত হল কারখানার মজুরে। সমাজ-জীবনে তৈরী হল ধনী সম্প্রদায় ও মজুর শ্রেণী।

শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতাও ধীরে ধীরে ধনী দেশ ও ধনী ব্যক্তিদের করতলগত হতে লাগলো। প্রকৃতপক্ষে, শিল্প-বিপ্লব মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে এক নতুন সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরী করে দিল। এই ক্ষেত্র হল পৃথিবী-ব্যাপী অসংখ্য নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

রাজনৈতিক ক্ষমতা

ফরাসী বিপ্লব

যে ঘটনা মানুষের আজকের সভ্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে সেই ঘটনাটি হল ফরাসী বিপ্লব। কিন্তু এই যুগান্তকারী ঘটনাটি হঠাৎ করে কোন আকস্মিক ঝোঁকের মাথায় ঘটে নি, ঘটেছে বহুদিন ধরে জমে থাকা নানা অভিযোগের বিস্ফোরণে। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলোর অনুসন্ধান খুব সহজ কাজ নয়।

॥ **বিপ্লবের কারণ** ॥

বিপ্লবের প্রথম কারণ হল সর্বশক্তিমান ফ্রান্সের রাজতন্ত্র। ফ্রান্সের রাজারা ছিলেন স্বৈরাচারী। কিন্তু দুর্বল রাজাদের সুযোগে সেখানকার অভিজাতগণ ক্রমশ দেশশাসনে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। আর তখন রাজারা দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে ভোগবিলাসে ডুবে থাকতেন। সুতরাং এই অবস্থায় দেশ ও দেশের মানুষের কি অবস্থা হতে পারে তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

রাজতন্ত্রের অবস্থা

দ্বিতীয়ত, সামাজিক দিক থেকে ফ্রান্সের মানুষ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত—কিছু সংখ্যক সুবিধাভোগী আর অধিক সংখ্যক সর্বপ্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সুবিধাভোগীদের দলে ছিল যাজক ও অভিজাতগণ। আর বঞ্চিতদের মধ্যে ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি। সুবিধাভোগীরা সবরকম রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করতো। কিন্তু বঞ্চিতদের মধ্যে মধ্যবিত্তরা সবদিক থেকে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোন অধিকারই ভোগ করতে পারতো না। ফলে তাদের মধ্যে ক্রমশ বিক্ষোভ জমে উঠতে থাকে। অভিজাতগণ রাজার সমর্থক ছিল বলে মধ্যবিত্তগণ রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। পরে সাধারণ কৃষক এবং শ্রমিকরাও মধ্যবিত্তদের সঙ্গে যুক্ত হয়—সবরকম বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে।

সামাজিক অবস্থা

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিতগণই দেশের সকল করভার বহন করতো। সুবিধাভোগীদের কোন করই দিতে হত না। অন্যদিকে সুবিধাভোগীদেরই ভোগবিলাসের দাবী মেটাতে সাধারণ মানুষের অর্থই ব্যয় করা হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এদিকে দেশের মানুষ যখন কর দেবার ক্ষমতার শেষ সীমায় তখন রাজকোষও সম্পূর্ণ কর্পদকহীন। রাজাদের অমিতব্যয়ী জীবন-যাপন, তাঁদের আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারে ব্যর্থতা, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যয়ভার বিপ্লবের আগে আগে ফ্রান্সকে ঋণভারে জর্জরিত করে ফেলেছিল।

চতুর্থত, এই সময় ফ্রান্সে কিছু সংখ্যক দার্শনিক জন্মেছিলেন, যাঁরা দেশের প্রকৃত অবস্থা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন, তাদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মণ্টেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশো।

দার্শনিকদের ভূমিকা

মণ্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত "দি স্পিরিট অফ লজ" গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘোষণা করেন দেশের আইন, বিচার ও শাসন—এই তিন বিভাগকে পৃথক করতে হবে। মণ্টেস্কুর ঘোষণা সে সময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

মণ্টেস্কু

ভলতেয়ার ছিলেন এ সময়ের একজন শক্তিশালী কবি। তিনি তাঁর তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতার মধ্য দিয়ে অভিজাতদের ভোগবিলাস ও চার্চের দুর্নীতিকে প্রকাশ করে দেন। তিনি নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচনাবলী দেশের লোককে সজাগ ও সচেতন করে তুলেছিল।

ভলতেয়ার

রুশো ঘোষণা করলেন দেশের মানুষই দেশের প্রকৃত শাসক। সুতরাং রাজাকে জনগণের মতানুসারেই চলতে হবে রুশোর এই ঘোষণা মানুষকে বিদ্রোহী মন গড়ে নিতে সাহায্য করলো।

রুশো

পঞ্চমত, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকার সাফল্য ফরাসীদের মধ্যে এক বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তারা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো, ঐক্যবদ্ধ হলে কোন শক্তিই অপরাজেয় নয়। এই ঐক্যই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছিল আমেরিকার প্রধান শক্তি।

॥ বিপ্লবের সূচনা ও বিস্তৃতি ॥

এই যখন দেশের সামগ্রিক অবস্থা তখন অর্থের প্রয়োজন মেটাতে রাজা ষোড়শ লুই দেশের প্রতিনিধি সভা স্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হলেন। এই প্রতিনিধি সভা যাজক, অভিজাত ও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ছিল। এতকাল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি আলাদা-ভাবে অধিবেশনে বসতেন। এবার দাবী উঠলো তিন শ্রেণীকে এক সঙ্গে অধিবেশনে বসতে হবে। অনেক টালবাহানার পর রাজা এ দাবী মেনে নিলেন। এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে স্টেট্স জেনারেল ন্যাশনাল এ্যাসেম্ব্লি বা জাতীয় সমিতিতে পরিণত হল।

জাতীয় সমিতি

কিন্তু রাজা গোপনে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন। কারণ প্রশাসনিক এই পরিবর্তন তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। এতে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে প্যারিসের বন্দীশালা বাস্তিল দুর্গ দখল করে নিল। এই ঘটনা অতিদ্রুত গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে যেতেই অত্যাচারী জমিদার ও রাজকর্মচারীদের হত্যা আরম্ভ হল।

বাস্তিল দুর্গ দখল

ঠিক এ সময়েই জাতীয় সমিতি সিদ্ধান্ত নিল, সুবিধাভোগীদের সকল প্রকার সুবিধার বিলোপসাধন করা হবে এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—এই তিন লক্ষ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে দেশের ভবিষ্যৎ।
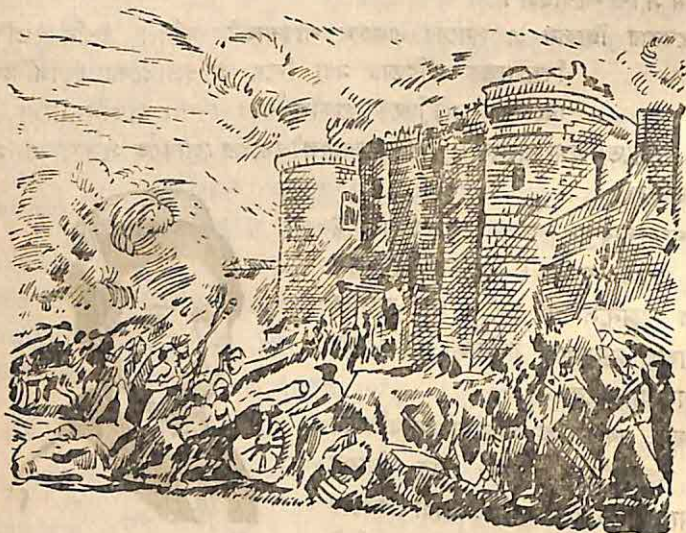
জাতীয় সমিতির সিদ্ধান্ত

বাস্তিল দুর্গ দখল

কিন্তু রাজা ও সুবিধাভোগীরা এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন না। অন্যদিকে দেশে তখন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ প্যারিসের নিকটে ভার্সাই রাজপ্রাসাদ অবরোধ করতে চললো।

ভার্সাই প্রাসাদ অবরোধ

সেই সুযোগে জাতীয় সমিতি রাজার ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস করলো, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করলো, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো এবং করভার হ্রাস করলো।

রাজা এই সব পরিবর্তনে মত দিতে বাধ্য হলেন বটে, তবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় তিনি ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর পলায়নের চেষ্টাও ধরা পড়ে যাওয়ায় তিনি বন্দী হলেন।

রাজার পলায়ন চেষ্টা

॥ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ॥

ফ্রান্সের বিপ্লবীরা রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল না। কিন্তু রাজার চক্রান্ত ধরা পড়ে যাওয়ায় তারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলো। গঠিত হল অস্থায়ী সরকার এবং জাতীয় সমিতি। এইবার পরিবর্তিত হল জাতীয় সম্মেলন বা কনভেনশনে। এই কনভেনশনের ওপর দেশের নতুন সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হল। কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার বিদেশী

জাতীয় সম্মেলন

আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা থেকে দেশরক্ষায় যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, তা ফরাসী দেশের ইতিহাসে এক কলংকিত অধ্যায়।

॥ সন্ত্রাসের রাজত্ব ॥

সন্দেহ নেই জাতীয় সম্মেলনের সম্মুখে সংকট ছিল খুবই ভয়াবহ। একদিকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফ্রান্স আক্রমণের আশংকা, অন্যদিকে দেশের গৃহবিবাদ অবস্থাকে জটিল করে তুলেছিল। তার ওপর কনভেনশনেও ছিল নানা বিষয়ে মত বিরোধ। এই অবস্থার মোকাবিলায় অস্থায়ী সরকার সন্ত্রাসের পথই বেছে নিল। এই পথের প্রতীক ছিল গিলোটিন নামে এক বধযন্ত্র। নামমাত্র বিচারের পরেই এই যন্ত্রে অভিযুক্তর শিরশ্ছেদ করা হত। মাত্র পনের মাসের মধ্যে এই যন্ত্রে প্রায় ১৬০০ লোকের প্রাণদণ্ড হয়। রাজা ষোড়শ লুই ও রানী আঁতোয়ানেৎ-কেও হত্যা করা হয় গিলোটিনে। এমন কি সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রধান রোবস্পীয়রেরও মৃত্যু হয় এই বধযন্ত্রে।
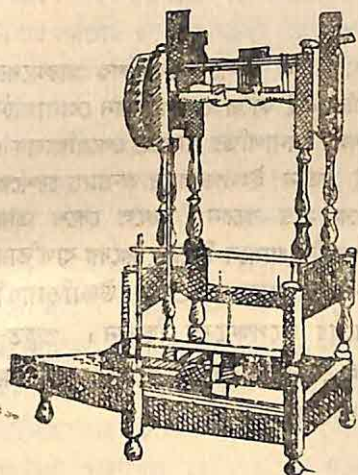
গিলোটিন

রোবস্পীয়রের পর দেশের শাসনভার নরমপন্থীদের হাতে আসে। কিন্তু দেশের

ষোড়শ লুই

রানী আঁতোয়ানেৎ

সংকট নিরসনে তারাও দক্ষতা দেখাতে পারলো না। ইংলণ্ড, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, স্পেন,

জার্মানি, ইটালী প্রভৃতি রাজ্যগুলো তখন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ। আবার রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং চরমপন্থীরাও দেশের শাসনভার দখল করতে উদগ্রীব। এই অবস্থায় জাতীয় সম্মেলনের কার্যকাল শেষ হল। রচিত হল নতুন সংবিধান এবং সেই সংবিধান অনুসারে পাঁচজন ডিরেক্টরের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়া হল।

দেশের সংকট

॥ ডিরেক্টরদের শাসনকাল ॥

শাসনভার পেয়েই ডিরেক্টরদের প্রথম কাজ হল দেশকে বৈদেশিক আক্রমণের আশংকা থেকে মুক্ত করা। তাঁদের সৌভাগ্য যে তাঁরা এই কাজে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে এক অসাধারণ সমরকুশলী সেনাপতির সাহায্য পেয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইংলণ্ড বাদে অন্যান্য দেশকে পরাজিত করে দেশকে বিদেশী আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত করেন। ফলে দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা অসম্ভব বেড়ে যায়। অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ শাসনে ডিরেক্টরদের ব্যর্থতায় তাঁদের সম্পর্কে জনগণের বিক্ষোভও দানা বাঁধতে থাকে। প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী নেপোলিয়ন ঠিক এ রকম একটা পরিস্থিতির সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে বৈদেশিক ক্ষেত্রে যা কিছু সাফল্য তা হল বোনাপার্টের এক কৃতিত্ব, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার সবটুকু দায়ভার হল ডিরেক্টরদের।

ডিরেক্টরদের ব্যর্থতা

॥ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ॥

ডিরেক্টরদের গণসমর্থনের অভাবের সুযোগে নেপোলিয়ন তাঁদের অপসারণ করে কন্‌সালেট নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নতুন শাসনব্যবস্থায় প্রধান হলেন তিনি নিজে। অল্পদিনের মধ্যে তিনি দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন। বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বশ্যতাসূচক মৈত্রী স্থাপিত হল। দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে ক্লান্ত ফরাসী জনগণও চাইছিল শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম কঠোর নেতৃত্ব। তাই নেপোলিয়নের একক নেতৃত্ব মেনে নিতে দেশবাসীর মনে আর কোন দ্বিধা ছিল না।

উত্থানের কারণ

এই মনোভাবের সুযোগেই নেপোলিয়ন ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলেন। ফলে রাজতন্ত্রের বিলোপসাধনের মধ্য দিয়ে যে ফরাসী বিপ্লব পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল, সেই বিপ্লবের সুযোগেই আবার নেপোলিয়ন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন।

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

যাইহোক, নেপোলিয়নের সমর নৈপুণ্যে ইউরোপের মানচিত্র নতুনভাবে অংকিত হল। কিন্তু তা খুবই সাময়িক। কেননা পরাজিত দেশসমূহ সুযোগ

খুঁজতে লাগলো নেপোলিয়নের এই অখণ্ড প্রতাপ খর্ব করার। নেপোলিয়নের দিক থেকেও দু'টি মারাত্মক ভুল হয়ে গেল। একটি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অন্ধ বিরোধিতা, অন্যটি হল স্পেনের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত বিরোধে নেপোলিয়নের অন্ধ ক্ষমতালিপ্সার নগ্ন প্রকাশ। ফলে ইউরোপের শক্তিগুলো আবার সমবেত হতে লাগলো আরেকবার নেপোলিয়নের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়। শেষ পর্যন্ত এই সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হয়েই নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্জন নির্বাসনে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। আর ষোড়শ লুই-এর ভ্রাতা আবার রাজা হয়ে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। কিন্তু
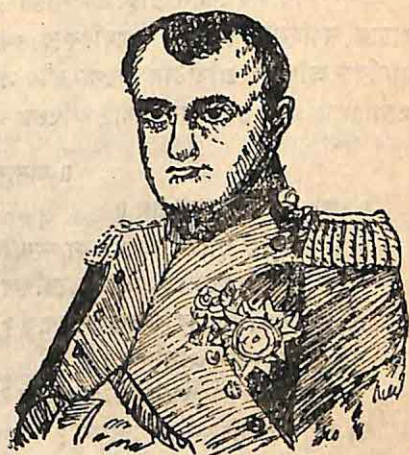
নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন সমগ্র জাতির মধ্যে যে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর রচিত আইনসমূহ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই আইনগুলোর মধ্যে কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের মূল নীতিগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে। এখানেই প্রমাণিত হয় বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে নেপোলিয়নের ছিল কত গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা।

॥ ফরাসী বিপ্লবের চিরস্থায়ী প্রভাব ॥

ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব যেন যুগ সন্ধিক্ষণ। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং সুবিধাভোগী অভিজাত সমাজ ইউরোপের দেশে দেশে ছিল এক বহু পরিচিত ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল দীর্ঘকাল ব্যাপী। এই পরিচিত ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত হানলো ফরাসী বিপ্লব।

প্রচলিত ব্যবস্থায় ফাটল

শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার তো মানুষের জন্মগত অধিকার। দীর্ঘকাল এই অধিকার ছিল ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকারের নীতি যথাযোগ্য স্বীকৃতিলাভ করলো।

মানুষের সমান অধিকার

সবচেয়ে বড় কথা হল, ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। মূলমন্ত্রই পরবর্তীকালে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নিয়ে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আজ যে গণতন্ত্রের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত, তার জন্ম ফরাসী বিপ্লবের গর্ভেই। আর এই গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই স্বীকৃতি পেল বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনমতের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য।

গণতন্ত্রের সূচনা

● এই অধ্যায়ের মূল কথা ●

শিল্প-বিপ্লব যেমন প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জয় যাত্রার কাহিনী, তেমনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব মানুষের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আপোসহীন সংগ্রাম। আরেকবার প্রমাণিত হল, মানুষ তার চলার পথে যে কোন বাধাই অতিক্রম করার শক্তি রাখে।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) **রচনামূলক প্রশ্ন** ॥

১। কি কি কারণে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল ? স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকা সাফল্যলাভ করেছিল কেন ?
২। শিল্প-বিপ্লব বলতে কি বোঝ ? এই বিপ্লবের ফলে শিল্পে ও কৃষিতে কি পরিবর্তন এসেছিল ?
৩। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলো আলোচনা কর।
৪। নেপোলিয়ন কে ছিলেন ? কিভাবে তিনি আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ?
৫। ফরাসী বিপ্লবের চিরস্থায়ী প্রভাবগুলো আলোচনা কর।

॥ (খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন** ॥

১। কোন ঘটনা থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয় ?
২। শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল কেন ?
৩। শিল্প-বিপ্লবের ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কি হল ?
৪। ফরাসী বিপ্লবে মধ্যবিত্তদের ভূমিকা কি ছিল ?
৫। ফ্রান্সে জাতীয় প্রতিনিধি সভা কিভাবে জাতীয় সমিতিতে পরিণত হয় ?
৬। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ
স্ট্যাম্প আইন, জর্জ ওয়াশিংটন, মণ্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো, রোব্‌সপীয়র।

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(অ) —খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
(আ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন—।
(ই) রেলইঞ্জিন আবিষ্কার করেন —।
(ঈ) 'দি স্পিরিট অফ লজ' গ্রন্থের লেখক হলেন —।
(উ) — বিরুদ্ধে অন্ধ বিরোধিতা নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ।
(ঊ) নেপোলিয়ন বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর — জন্য।
২। 'ক' স্তম্ভে কয়েকজন ব্যক্তির নাম আর 'খ' স্তম্ভে তাঁদের পরিচয় দেওয়া আছে। 'ক' স্তম্ভের ব্যক্তিদের সঠিক পরিচয় মেলাও ঃ

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
(অ) জর্জ ওয়াশিংটন	(অ) রাজ-রানী

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
(আ) রুশো	(আ) সন্ত্রাসের নায়ক
(ই) রোবস্পীয়র	(ই) বৈজ্ঞানিক
(ঈ) ক্রম্পটন	(ঈ) রাষ্ট্রপতি
(উ) আঁতোয়ানেৎ	(উ) দার্শনিক

৩। ফরাসী বিপ্লবের কতকগুলো ঘটনা নীচে দেওয়া গেল। ঘটনাগুলো ঘটার সময়ানুক্রম অনুসারে পর পর সাজাও ঃ
কনসালেট, বাস্তিল দুর্গ দখল, জাতীয় কনভেনশন, জাতীয় সমিতি, ভার্সাই রাজপ্রাসাদ অবরোধ, গিলোটিনে হত্যা।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। ফ্রান্সে সুবিধাভোগী বলতে কাদের বোঝাতো ?
২। আমেরিকায় ইংলণ্ড কিসের ব্যয়ভার চাপাতে চেয়েছিল ?
৩। নেপোলিয়ন শেষ জীবন কোথায় কাটান ?
৪। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের সম্রাট কে ছিলেন ?
৫। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে ফরাসীরা কি শিক্ষা পেয়েছিল ?
৬। ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র কি ছিল ?

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা** ॥

১। একটি ইউরোপের মানচিত্র এঁকে তাতে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ কর।
২। জর্জ ওয়াশিংটন ও নেপোলিয়নের শৈশবকালের স্মৃতিকথা সংগ্রহ কর।
৩। কোন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বাসস্থান এলাকা পরিদর্শন করে কারখানা ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জেনেছো তার সত্যতা যাচাই করে দেখো।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী ঃ বিপ্লবের যুগ।
(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ — কারণ— আমেরিকার সাফল্যের কারণ — ফলাফল।
(খ) ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব — ইহার অর্থ — কৃষি বিপ্লব — আবিষ্কার — ফলাফল।
(গ) ফরাসী বিপ্লব ঃ (i) প্রাক্-বিপ্লব চিন্তাধারা — কয়েকজন বিখ্যাত নেতা — রুশো, ভলতেয়ার, মণ্টেস্কু— বিপ্লবের কারণ ও প্রসার (সংক্ষিপ্তাকারে)।
(ii) বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ন — ইউরোপের বিদ্রোহ।
(iii) ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল।

॥ নবম অধ্যায় ॥

ইউরোপ : ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকাল

বিষয়-সংকেত

মানুষের জাগ্রত চেতনাকে প্রতিহত করার চেষ্টা যে কত অসহায় নেপোলিয়নের পতনের পরবর্তীকালের ইউরোপের ইতিহাস তার এক চমৎকার উদাহরণ। সেই ইতিহাসই এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়।

নেপোলিয়নের পতন ইউরোপের প্রধান চারটি দেশের সম্মুখে এক নতুন সংকট সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে নেপোলিয়ন যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, তাঁর পতনের পর সেই সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন ছিল এই সংকটের মূলে। ফরাসী বিপ্লব ও দীর্ঘকাল নেপোলিয়নের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকার ফলে ছোট ছোট জাতিগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। এই চেতনাকে যথাযথ মূল্য দিলে ঐ চার শক্তির স্বার্থ রক্ষিত হয় না। সুতরাং সংকট ছিল প্রকৃতপক্ষে যথেষ্টই গভীর।

পতনের প্রতিক্রিয়া

এই পটভূমিকায় নেপোলিয়ন-বিজেতারা **১৮১৫** খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনাতে এক সম্মেলনে বসলেন। সম্মেলনে প্রধান ভূমিকা নেয় ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া। এদের প্রধান কাজ হল, নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত করা। এ কাজে তারা যে নীতি স্থির করে তার নাম ন্যায্য অধিকার নীতি। এই নীতির অর্থ হল, নেপোলিয়ন যে সকল রাজবংশকে উচ্ছেদ করেছিলেন, তাদের নিজ নিজ রাজত্ব আবার ফিরিয়ে দেওয়া। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশ, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ বংশ, স্পেনে বুরবোঁ বংশের একটি শাখা তাদের হারানো রাজত্ব আবার ফিরে পেলেন। কিন্তু নীতির প্রয়োগ ব্যতিক্রম ঘটলো জার্মানি, ইটালী, বেলজিয়ম ও নরওয়ের ক্ষেত্রে।

ভিয়েনা সম্মেলন

এই ব্যতিক্রমের কারণও খুব স্পষ্ট। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাদের এটাও লক্ষ্য ছিল যে, ফ্রান্স যেন আবার কখনোই ইউরোপে আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে না পারে তেমন ব্যবস্থা করা। তাছাড়া নেপোলিয়নের পরাজয়ে যে সব দেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তাদের উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা।

স্বার্থ সংরক্ষণ

সুতরাং, ভিয়েনা সম্মেলনে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা ছিল বৃহৎ শক্তিদের নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূলে। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আর তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কেননা ন্যায্য অধিকার নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশে আবার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত হল। কিন্তু ঐ সব দেশে ততদিনে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল। তার ফলে ঐ দেশগুলোর আবার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

সম্মেলনের ফলাফল

তাছাড়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় চেতনা যেভাবে ভিয়েনা সম্মেলনে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল তাও ছিল মারাত্মক। নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে, ফিনল্যান্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে, পোল্যান্ডকে বিভক্ত করে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে, বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়। অথচ এই সব দেশের সংস্কৃতি, ভাবধারা ও অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। স্বভাবতই এই অস্বাভাবিক সংযুক্তিকরণ কখনোই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না।

উপেক্ষিত জাতীয়তাবোধ

॥ মেটারনিক প্রথা ॥

মেটারনিক ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী, সুদর্শন, সুপণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ এবং দুর্ধর্ষ কূটনীতিবিদ ও আইনবিদ। ভিয়েনা সম্মেলনে তিনিই ছিলেন সভাপতি। দীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল ইউরোপের রাজনীতিতে ছিল তাঁর প্রবল প্রতাপ। এর থেকেই এসেছে মেটারনিক প্রথা কথাটি।

এই প্রথার মূলকথা হল, পুরাতন ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে অভিজাতদের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য মেটারনিকের এই লক্ষ্যের পেছনে গূঢ় কারণ ছিল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যই ছিল নানা জাতি ও ভাষাভাষি নিয়ে গঠিত। তাই পুরাতন ব্যবস্থা ব্যতীত বহুধা-বিচ্ছিন্ন অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে ঐক্যবন্ধ রাখার কোন উপায়ই ছিল না।

মেটারনিক

কিন্তু মানুষের মনোভাবের ততদিনে ঘটে গিয়েছে বিরাট পরিবর্তন। যখন আর নদীর স্রোতধারাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবার কোন উপায় ছিল না তখন মেটারনিক প্রথা সেই চেষ্টাই করেছিল। সুতরাং ব্যর্থতাও ছিল অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ করে ততদিনে জাতীয় চেতনা বিভিন্নদেশে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

॥ ইউরোপের শক্তি সংঘ ॥

ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ যাই করুন না কেন, মনে মনে তাঁরা কিন্তু নিশ্চিত জানতেন ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে যে দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাকে নিভিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়। তাই তাঁরা প্রতিরোধমূলক নানা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তার একটি হল ইউরোপে শক্তি সংঘ গঠন।

কারণ

শক্তি সংঘ গঠনের প্রথম উদ্যোক্তা হলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার। তাঁর পবিত্র চুক্তির পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তিনি শক্তি সংঘ গঠনে উদ্যোগী হন। পবিত্র চুক্তির মর্ম কথা হল প্রত্যেক রাজা, খ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শ অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন। কিন্তু এই উদ্যোগ সফল হয় নি।

পবিত্র চুক্তি

এই উদ্যোগের ব্যর্থতার পর মেটারনিক চার শক্তির সংঘ গড়ে তোলেন। সংঘের উদ্দেশ্য হল, ইউরোপে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করা। চার শক্তি হল—অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ড। এরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী ভাবধারা ও জাতীয় চেতনা দমনে ছিল অত্যন্ত তৎপর।

চার শক্তি সংঘ

॥ ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং ইটালী ও জার্মানির জন্ম ॥

বৃহৎ চার শক্তি যে চেষ্টাই করুন না কেন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কিন্তু স্তব্ধ করে দেওয়া গেল না। প্রত্যেক জাতি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দেশে বাস করবে—এটা তো মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে ইউরোপে আরম্ভ হল আন্দোলন। আন্দোলন থেকেই জন্ম হল দুটি আধুনিক রাষ্ট্রের – ইটালী ও জার্মানি।

॥ ইটালীর ঐক্য সাধন ॥

ইটালী ছিল কতকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। সেখানে রাজত্ব করতেন অত্যাচারী বিদেশী রাজারা। জনগণের জীবন ছিল দুর্বিষহ। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ইটালী জয় করেন। এই জয়ে ইটালী এক কেন্দ্রীয়শাসনের অধীনে থাকার ফলে জাতীয় ঐক্য লাভ করে।

নেপোলিয়নের শাসন

কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে আবার ইটালী দেশটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। পীডমণ্ট ও পোপের রাজ্য ছাড়া সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হল অস্ট্রিয়ার স্বৈরতন্ত্র।

ইটালীতে আন্দোলন শুরু হল। আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য এবং গণতন্ত্র। গঠিত হল কারবোনারি নামে এক গুপ্ত সমিতি। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দেখা দিল নেপল্‌স ও পীডমণ্টে; তারপর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য ইটালীর দেশগুলোতে। দুবারই অস্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনী কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করলো। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ হল আরও দুর্বার এবং সারা ইটালী জুড়ে। পীডমণ্টের রাজার নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু নিজেদের দলাদলি ও বিশ্বাসঘাতকতায় অস্ট্রিয়া আবার স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করলো।

কারবোনারি

কিন্তু মুক্তিকামী মানুষকে তো দীর্ঘকাল দমন করে রাখা যায় না। ইটালীয়দের

মনে আবার নতুন ভাবে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করলেন বিপ্লবগুরু ম্যাৎসিনি। তিনি প্রথমে কারবোনারি গুপ্ত সমিতিতে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বুঝেছিলেন, কেবল গুপ্ত সমিতি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্য আসতে পারে না। তাই তিনি গঠন করলেন তরুণ ইটালী নামে এক দল। দলের লক্ষ্য হল তিনটি—অস্ট্রিয়াকে উচ্ছেদ করা, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসন করা। ম্যাৎসিনির উদ্দীপনাময় ভাষণে নির্বাচিত দেশের তরুণ সমাজ আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল।

ম্যাৎসিনি

ম্যাৎসিনি

ম্যাৎসিনির আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন পীডমণ্টের মন্ত্রী কাউণ্ট ক্যাভুর। তিনি দেখলেন, কেবল আদর্শবাদ দিয়ে ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্য সম্ভব নয়। কেননা সে পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হল অস্ট্রিয়া আর অস্ট্রিয়াকে পর্যুদস্ত করতে প্রয়োজন কূটকৌশল। তিনি তিনটি নীতি স্থির করে নিলেন। প্রথম, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করবেন পীডমণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল। কারণ, তিনি নিজ দেশেই গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করেছেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছেন। দ্বিতীয়, অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব সংগ্রহ করতে হবে। তৃতীয়, দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্যলাভের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ক্যাভূর

ক্যাভুর

এই সময় ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন। ক্যাভুর তাঁর সঙ্গে এক চুক্তিতে স্থির করলেন, পীডমণ্ট ও ফ্রান্স যুক্তভাবে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে জয়লাভ হলে পীডমণ্ট পাবে লম্বার্ডি ও ভিনিশিয়া, ফ্রান্স পাবে স্যাভয় ও নাইস। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও পীডমণ্ট বাহিনী অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করলো। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় পীডমণ্ট পেল শুধুমাত্র লম্বার্ডি। কিন্তু মধ্য ইটালীর অধিবাসিগণ নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে পীডমণ্টের সঙ্গে যুক্ত হল।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ

মধ্য ইটালীতে যে বিদ্রোহের সূচনা হল তা বিস্তৃত হল সিসিলি দ্বীপে। সেখানে গণবিদ্রোহ পরিচালিত করলেন গ্যারিবল্ডী নামে সামরিক নেতা। তরুণ বয়স থেকেই তিনি তরুণ ইটালী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি পালিয়ে যান দক্ষিণ আমেরিকায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবের সময় ফিরে এসে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু বিপ্লব ব্যর্থ হলে আবার তিনি আত্মগোপন করেন।

গ্যারিবল্ডী

এরপর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিসিলিতে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাঁর 'লাল কুর্তা' নামে স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি সিসিলি দখল করে নেপ্‌ল্‌স-এ উপস্থিত হন। সেখানকার রাজাকে তাড়িয়ে তিনি অর্ধেক ইটালীকে বিদেশী শাসনমুক্ত করেন।

এদিকে উত্তর দিক থেকে পীডমণ্টের বাহিনী পোপের রাজ্য দখল করে নেপ্‌ল্‌স-এ গ্যারিবল্ডীর বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। এবার গ্যারিবল্ডী ভাবলেন তাঁর কর্তব্য শেষ। আবার তিনি জনচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগী দেশপ্রেমিক পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

ঐক্য সম্পূর্ণ

শেষপর্যন্ত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ইটালী স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হল। এরও পাঁচ বছর পর অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার হাতে পরাজিত হলে ভিনিশিয়া ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়নও প্রাশিয়ার কাছে পরাজিত হলে রোম থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারিত হয়। সেই সুযোগে ভিক্টর ইমানুয়েল রোম দখল করে তাকে স্বাধীন ইটালীর রাজধানীরূপে ঘোষণা করেন। ইটালীর ঐক্য এইভাবে সম্পূর্ণ হল।

॥ জার্মানির ঐক্য সাধন ॥

ইটালীর মত জার্মানিও ছিল ছোট ছোট সাড়ে তিনশ' রাজ্যে বিভক্ত। এদের মধ্যে প্রধান ছিল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া। নেপোলিয়ন এই দুই রাজ্য বাদ দিয়ে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ

ভিয়েনা সম্মেলনে আবার জার্মানি আটত্রিশটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। পুরানো রাজারা তাঁদের ক্ষমতা ফিরে পেলেন। ফলে জার্মানিতে বিক্ষিপ্ত-ভাবে বিদ্রোহ হলেও অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সেনাবাহিনীর পক্ষে তা দমন করা কঠিন হয় নি। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও জার্মানির নানা স্থানে বিপ্লব দেখা

দিল। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা গণপরিষদে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে প্রাশিয়ার রাজাকে জার্মানির সিংহাসনে বসার আহ্বান জানালো। কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার ভয়ে এবং গণতন্ত্রের নামে ভীত হয়ে সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন।

বিসমার্ক

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা হলেন প্রথম উইলিয়ম। তিনি প্রাশিয়াকে সামরিক বলে শক্তিমান করে তুলতে এক পরিকল্পনা রচনা করেন। কিন্তু আইনসভা সে পরিকল্পনা অনুমোদন না করায় তিনি বিসমার্ক নামে এক দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রনায়ককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এই বিসমার্কই হলেন জার্মানির ঐক্য নির্মাতা।

বিসমার্ক একবার গণপরিষদে পরিষ্কার বলেছিলেন, বক্তৃতা বা ভোট দিয়ে জার্মানির সমস্যার সমাধান হবে না, সমাধান হবে অস্ত্র এবং রক্ত দিয়ে। তিনি ছিলেন ক্যাভুরের মতই বিচক্ষণ কূটনীতিক। কিন্তু তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না।

লক্ষ্য

বিসমার্ক নিজের পরিকল্পনামত প্রাশিয়াকে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী করে তুললেন। এরপর তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সেই সুযোগও এসে গেল। জার্মানি ও ডেনমার্কের মাঝখানে ছিল শ্লেসউইগ ও হলস্টাইন নামে দুটি ছোট জার্মান রাজ্য। কিন্তু এরা ছিল ডেনমার্কের অধীনে। জার্মান জাতীয়তাবাদের অজুহাতে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাহায্যে ডেনমার্ক আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ শেষে অস্ট্রিয়া চাইলো রাজ্য দুটি স্বাধীনভাবে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হোক। কিন্তু এটা বিসমার্কের মনঃপূত ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন রাজ্যদুটি গ্রাস করতে। সুতরাং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বেধে গেল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়লাভ হল প্রাশিয়ার। আর সেই জয়ের সূত্রে উত্তর জার্মানির বাইশটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হল প্রাশিয়ার অধীনে এক যুক্তরাষ্ট্র।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ

অস্ট্রিয়াকে পরাভূত করার পর বিসমার্ক অগ্রসর হলেন তাঁর দ্বিতীয় শত্রু ফ্রান্সের দিকে। তিনি নানাভাবে উত্যক্ত করতে লাগলেন ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নকে। শেষ পর্যন্ত তিতি-বিরক্ত নেপোলিয়ন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া আক্রমণ করে বসলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রাশিয়ান বাহিনীর কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। এমন কি প্রাশিয়া প্যারিস নগর পর্যন্ত অধিকার করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী রাজা উইলিয়ম সংযুক্ত জার্মানির সম্রাট বলে ঘোষিত হলেন। উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলো নিয়ে এইভাবে জন্ম হল আধুনিক জার্মানির।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
মেক্সিকো
মেক্সিকো উপসাগর
কা না ডা
ওয়াশিংটন
ওরিগন
ক্যালিফোর্নিয়া
নেভাদা
আইডাহো
মণ্ট্যানা
ওয়াইওমিং
ইউটা
কলোরাডো
আরিজোনা
নিউ মেক্সিকো
উত্তর ডাকোটা
দক্ষিণ ডাকোটা
নেব্রাস্কা
কানসাস
ওকলাহোমা
টেক্সাস
মিনেসোটা
আয়োয়া
মিসৌরী
আরকানসাস
উইসকনসিন
ইলিনয়
ইণ্ডিয়ানা
ওহিও
কেনটাকী
টেনেসী
মিসিসিপি
আলাবামা
জর্জিয়া
ফ্লোরিডা
পেনসিলভানিয়া
নিউইয়র্ক
মেইন
ভার্জিনিয়া
উঃ ক্যারোলিনা
দঃ ক্যারোলিনা
দাসপ্রথা রক্ষাকামী রাষ্ট্রসংঘ
দাসপ্রথা উচ্ছেদকামী যুক্তরাষ্ট্র
১.ভারমণ্ট ২ নিউ হ্যাম্পশায়ার ৩. ম্যাসাচুসেটস
৪.রোড দ্বীপ ৫.কনেকটিকাট ৬.নিউজার্সি ।
৭.ডেলাওয়ার ৮. মেরীল্যাণ্ড

॥ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ॥

বর্বর জীবন থেকে সভ্য জীবনে উন্নীত হবার চেষ্টায় মানুষ এক বর্বর প্রথাকেই বেছে নিয়েছিল। সে প্রথা হল দাসপ্রথা। মানুষের সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

আধুনিক ইতিহাসেও এই প্রথা দীর্ঘকাল চালু ছিল। তার প্রমাণ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।

দাস ব্যবস্থার কারণ

আমেরিকাতে বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য প্রচুর উৎপন্ন হত। ইউরোপের যে সব জাতি সেখানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তারা দেখালো দাস-শ্রমিক ব্যবহার করতে পারলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে। কিন্তু নিজ নিজ দেশ থেকে দাস সংগ্রহ করে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই শ্রমিকের চাহিদা মেটাবার জন্য ইউরোপীয় বণিকেরা আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ধরে এনে চড়াদামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতো। এইভাবে আমেরিকাতে ব্যাপক হারে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে দাসপ্রথা রদ করা নিয়ে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আমেরিকাতে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ খুব সহজ হয় নি।

॥ দাসপ্রথা নিয়ে বিরোধ ॥

অবস্থা

আমেরিকার উত্তরাঞ্চল হল মূলত শিল্পপ্রধান। সেখানে উৎপাদিত হত নানা শিল্পসামগ্রী। আর সে সব সামগ্রী নানা দেশে পাঠানো হত। সেখানকার কল-কারখানায় বা জাহাজে কাজ করবার জন্য ব্যবসায়িগণ মজুরি দিয়ে লোক খাটাতো। তার ফলে এই অঞ্চলে দাসপ্রথা প্রচলিত হওয়ার সুযোগ হয় নি।

প্রয়োজন

কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এই অঞ্চল ছিল কৃষিপ্রধান। কৃষিকাজে শিল্প-বাণিজ্যের মত লাভ হত না। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়াও উত্তরাঞ্চলের তুলনায় অনেক গরম। তাই এই অঞ্চলে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক পাওয়া সহজ ছিল না। ফলে দক্ষিণাঞ্চল পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয় দাসপ্রথাকে গ্রহণ করতে।

এভাবেই উত্তরাঞ্চল হয়ে গেল ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী আর দক্ষিণাঞ্চল ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক। উত্তর ও দক্ষিণের এই বিরোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে আরও বেশী উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে। কারণ উভয় অঞ্চলই চাইলো নতুন জায়গায় নিজেদের পছন্দমত ব্যবস্থা প্রচলন করতে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ তীব্র রূপ ধারণ করলো। উত্তরাঞ্চল থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন, আর দক্ষিণাঞ্চল থেকে স্টিফেন ডগলাস। নির্বাচনে জয় হল লিঙ্কনের। ভয় পেয়ে গেল দক্ষিণাঞ্চল। তাদের ভয় দাসপ্রথা উচ্ছেদ হবার। তাই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সুতরাং শুরু হল আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।

॥ গৃহযুদ্ধ, আব্রাহাম লিঙ্কন ॥

১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ এই পাঁচ বৎসর চলেছিল গৃহযুদ্ধ। এরই মধ্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন দাসপ্রথা বাতিল বলে ঘোষণা করেন। ফলে বহু নিগ্রো দক্ষিণ থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীতে যোগদান করলো। তবু দক্ষিণাংশ দমলো না। দুপক্ষের বহু লোক হতাহত হল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ লোকের দুর্দশার সীমা ছিল না। চারদিকে তখন শুধু হতাশা। কিন্তু সেই গভীর নৈরাশ্যেও লিঙ্কন আপন সংকল্পে অনড় হয়ে থাকলেন। তাঁর সংকল্প, যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া।

লিঙ্কন

দাসমুক্তি

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী দক্ষিণাঞ্চল লিঙ্কনের ধৈর্য ও দৃঢ়তার কাছে পরাজয় স্বীকার করলো। যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য অটুট থাকলো। দাসরা মুক্তি পেল, পেল নাগরিক অধিকার।

লিঙ্কনের মৃত্যু

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, যে মহাত্মা মানুষের মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দিতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সেই লিঙ্কনকে শেষ পর্যন্ত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

॥ শিল্পায়নে ইউরোপ ও তার প্রতিক্রিয়া ॥

যন্ত্রের প্রয়োজন

ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, কালক্রমে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে যায়। ফলে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে উৎপাদন পদ্ধতিতে এসেছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। যে উৎপাদন পদ্ধতি ছিল এতকাল মানুষের শ্রমনির্ভর, এবার তা হয়ে গেল যন্ত্রনির্ভর। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেছিল বেশী পরিমাণ উৎপাদন। আর বেশী পরিমাণ উৎপাদন কেবলমাত্র মানুষের কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রয়োজনই মানুষকে বাধ্য করলো উৎপাদনে সহায়ক বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করতে এবং সেই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হতে।

॥ উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলাফল ॥

যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল হল কারখানা প্রথার প্রচলন। এই কারখানা ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

দেখা গেল কারখানা প্রথায় উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি দেশই সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি হল তা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে, যারা ছিল কলকারখানার মালিক বা ব্যবসায়ী। এইভাবেই সৃষ্টি হল মূলধনী সম্প্রদায়।

পুঁজিপতির সৃষ্টি

অন্যদিকে যে সব শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ পরিশ্রমে অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হল, তারা দিনের পর দিন দারিদ্র্যে জর্জরিত হতে লাগলো। কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে চললো। বেড়েই যেতে লাগলো শ্রমিকের প্রতি বঞ্চনা। ফলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে লাগলো। উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য ক্রমশই নগ্নরূপ নিতে লাগলো।

শ্রমিকের বঞ্চনা

সুতরাং এমন অবস্থায় অনুসন্ধান চললো এমন এক ব্যবস্থার, যেখানে উৎপাদনের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু অধিক উৎপাদন অতিরিক্ত মুনাফা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে।

॥ কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্স ॥

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর সহকর্মী এঙ্গেল্স উৎপাদন ও তার বণ্টনের অসাম্য দূর করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন, তাই সমাজবাদ নামে পরিচিত। মার্কসীয় সমাজবাদের ভিত্তি হল ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হল অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সংঘাতেই ঘটে ইতিহাসে পরিবর্তন। বর্তমান মূলধনী সম্প্রদায় বা পুঁজিপতি ও বঞ্চিত শ্রমিকের সংঘাতের মধ্য দিয়েই সমাজবাদ কায়েম হবে এবং শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে। যেহেতু সমস্ত সম্পদই কোন না কোন শ্রমের ফল, সেহেতু শ্রমই হল সকল সম্পদ বণ্টনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। সর্বশেষে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকের স্বার্থ অভিন্ন হলেও দেশে দেশে পুঁজিপতিদের স্বার্থের পার্থক্য থাকে। মার্কস তাঁর সমাজবাদের নতুন নাম দিয়েছিলেন সাম্যবাদ বা কম্যুনিজ্ম।

মার্কসের মূলকথা

মার্কসীয় দর্শনে প্রভাবিত হয়ে জার্মানিতে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদ খুব বেশী সাফল্য লাভ করতে না পারলেও বিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদের প্রভাব বিশ্বব্যাপী। এই মতবাদের প্রথম সফল প্রয়োগ ক্ষেত্র হল আজকের সোভিয়েট রাশিয়া।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

ফরাসী বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে বীজ বপন করেছিল মানুষের মনে তা কালক্রমে অংকুরিত হল ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যবাদ হবার মধ্য দিয়ে। কিন্তু মানুষের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কখনো থেমে থাকে না। তাই আমেরিকার

গৃহযুদ্ধ যেমন সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সংগ্রাম তেমনি শোষিত মানুষের মুক্তির প্রয়াস হল মার্কসবাদ।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। ন্যায্য অধিকার নীতি বলতে কি বোঝ? এই নীতির উদ্ভব হয়েছিল কোথায়? এই নীতির প্রয়োগ হয়েছিল কোথায়? ব্যতিক্রম ঘটে কোথায়? কেন-ই বা সেই ব্যতিক্রম?

২। মেটারনিক প্রথা কি? এই প্রথা প্রয়োগ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল?

৩। ইটালীর ঐক্যসাধনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাঁরা? তাঁদের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। জার্মানি কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় আলোচনা কর।

৫। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়েছিল কেন? এই যুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কন কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। মেটারনিক কে ছিলেন? তাঁর লক্ষ্য কি ছিল?

২। পবিত্র চুক্তির উদ্যোক্তা কে ছিলেন? পবিত্র চুক্তি বলতে কি বোঝায়?

৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ
চার শক্তি সংঘ, কারবোনারি, তরুণ ইটালী

৪। আমেরিকায় দাসপ্রথার প্রচলন হয়েছিল কেন?

৫। মার্কসবাদের মূল ভিত্তি কি কি?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) ইউরোপে ভিয়েনা সম্মেলন থেকে প্রবল প্রতাপান্বিত —।

(আ) — মত দেশপ্রেমিক খুব কমই দেখা যায়।

(ই) জার্মানির ঐক্যসাধনের রূপকার হলেন —।

(ঈ) মানব প্রেমিক — আমেরিকান — আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

(উ) — হল ধনবৈষম্য দূর করার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

২। নিচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ

(অ) বিসমার্ক ক্যাভুরের মত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

(আ) গ্যারিবল্‌ডী তাঁর দায়িত্ব পালন করার পর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে
ন।

(ই) আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ছিল দাসপ্রথার সমর্থক?

(ঈ) কারবোনারি দেশের তরুণ সমাজকে প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।
(উ) মার্কসীয় বিপ্লব থেকেই এসেছিল কারখানা প্রথা।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। নেপোলিয়ন-বিজেতারা কোথায় সম্মেলনে বসেছিল ?
২। ভিয়েনা সম্মেলনের মূলনীতি কি ছিল ?
৩। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লিঙ্কনের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন ?
৪। এঙ্গেল্‌স কে ছিলেন ?
৫। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে কোন প্রথার প্রচলন হয় ?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ইউরোপের ইতিহাস

(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যাহা ন্যায্য অধিকার নীতির সমর্থনে চতুঃশক্তি মিতালি ও মেটারনিকের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত।

(খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জার্মানিতে) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ।

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ — মূল কারণসমূহ — আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা।

(ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন (যন্ত্র সভ্যতা)—ইহার ফলাফল – শ্রমিক শ্রেণী— মার্কস ও এঙ্গেল্‌স।

———

॥ দশম অধ্যায় ॥

চীন ও জাপানের কথা

বিষয়-সংকেত

ভারতের মত প্রাচীন সভ্যতার এক লীলাক্ষেত্র হল চীন। ভারতের মত তার ভাগ্যেও জুটেছিল বিদেশীদের হাতে লাঞ্ছনা। তারপর একদিন সে নিজের চেষ্টায় সেই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আর ছোট্ট দেশ জাপানের আবির্ভাব তো এশিয়ার এক বিস্ময়।

॥ চীনে বৈদেশিক অধিকার ॥

এক অতি প্রাচীন সুমহান সভ্যতার দেশ চীন বহুকাল পর্যন্ত বাইরের জগতের সঙ্গে আদৌ কোন সম্পর্ক রাখতো না। তারা চাইতো নিজেদের ধর্ম, রীতি ও নীতি নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে। বাইরের কোন ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহও ছিল না। তাই বাইরের কাউকে তারা নিজেদের দেশে ঢুকতেও দিত না। কেবল ক্যাণ্টন বন্দরে বিদেশীরা কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতো।

আবদ্ধতায় বিশ্বাস

কিন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহের উপনিবেশের লোভ এবং ব্যবসার লালসা চীনকে নিশ্চিন্ত নিরাপদে থাকতে দিল না। তাদের শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে চীনকে অবাধভাবে পাওয়ার লোভে নানা উপায়ে তারা চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো।

ইউরোপীয়দের লোভ

এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিল ইংলণ্ড। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে আফিম পাঠিয়ে যথেষ্ট লাভ করতো। কিন্তু আফিমের নেশা দেশবাসীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর বলে চীনের মাঞ্চু রাজবংশ আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করেন। এই নিষেধাজ্ঞা ছিল ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত। সুতরাং আরম্ভ হল ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ। আফিমকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হয়েছিল বলে এই যুদ্ধকে 'আফিমের যুদ্ধ'-ও বলা হয়।

আফিমের যুদ্ধ

যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা। সন্ধি অনুসারে চীন ইংলণ্ডকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিল, হংকং বন্দর ইংলণ্ডের হাতে ছেড়ে দিল, তা ছাড়া আরও পাঁচটি বন্দর ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এই যুদ্ধের ফলেই চীনের বন্ধ দরজা বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার সূচনা হল।

নানকিং সন্ধি

এরপর থেকেই আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ চীনের সঙ্গে নানা বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করতে লাগলো। এমন কি চীনে খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকের আসাও চীন স্বীকার করে নিল।

কিন্তু এতেও ইউরোপীয় দেশগুলো খুশী হতে পারলো না। তারা চাইলো আরো বেশী সুযোগ-সুবিধে। চীনও আর কোন অতিরিক্ত সুবিধে দিতে বদ্ধপরিকর নয়। সুতরাং আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেল। প্রয়োজন ছিল কোন অজুহাতের। তাও জুটে গেল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী ধর্মযাজককে বিদ্রোহী উস্কানী দেওয়ার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। এ সময়েই আবার এক ইংরেজ নাবিককে বে-আইনী আফিমের ব্যবসার অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হল। ফলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ

যুদ্ধের সমাপ্তি হল টিয়েন সিনের সন্ধির দ্বারা। স্থির হল, আরো এগারোটি বন্দর বিদেশীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে, বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করা হবে, খ্রীষ্টান যাজকেরা অবাধে ধর্মপ্রচার করতে পারবে, পিকিং-এ বিদেশী রাষ্ট্র দূতাবাস স্থাপন করবে এবং বিদেশীগণ চীনে চৈনিক আইন থেকে মুক্ত থাকবে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে চীনকে বিদেশীদের কাছে মুক্ত করে দিল।

টিয়েন সিনের সন্ধি

কিন্তু এতেও চীনের দুর্গতির শেষ হল না। তার প্রতিবেশী জাপানও চাইলো চীন শোষণের ভাগ। চীন জাপানের মাঝখানে চীনের করদ রাজ্য কোরিয়া। জাপান কোরিয়া থেকে চীনদের তাড়িয়ে দিয়ে মাঞ্চুরিয়ার একাংশ ও অন্যান্য নানা সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিল। তরমুজ কেটে যেমন লোকে ভাগ করে খায়, চীনকেও বিভিন্ন দেশ এইভাবে কেটে কেটে ভাগ করে নিয়ে নিজেদের শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করলো। ইংলণ্ড এক চুক্তি বলে আরো চারটি বন্দর ও পর্যটকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিল। রাশিয়া আমুর নদী পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিল। ফ্রান্স দখল করলো আনাম ও টনকিন। ইংলণ্ডও ব্রহ্মদেশ ও সিকিম জয় করলো।

জাপানের লোভ

কিন্তু চীন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় বিপন্ন বোধ করলো আমেরিকা। কেননা চীন এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তাই সে চাইলো চীনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে। আমেরিকার এই ঘোষণায় অন্যান্য দেশকে একটু থমকে দাঁড়াতে হল।

আমেরিকার নীতি

॥ চীনে অন্তর্বিপ্লব ॥

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনে তাইপিং বিপ্লব ঘটে। তাইপিং শব্দের অর্থ পবিত্র রাজ্য। লোকসংখ্যার চাপ, ইয়াংসির বন্যা, জনগণের দারিদ্র্য এবং মাঞ্চু রাজাদের দুর্নীতি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এ সময়ে ইংলণ্ডের হাতে চীনের পরাজয় দেশবাসীকে মাঞ্চু রাজবংশ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তারা চাইলো এই রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে এক নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

মাঞ্চুশাসনের বিরোধিতা

তাইপিং বিপ্লবের নেতা ছিলেন হুং-সিও-চুয়ান নামে এক পণ্ডিত। চীনের প্রায় ষোলটি প্রদেশে এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। শেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সামরিক সাহায্যে মাঞ্চু রাজারা এই বিপ্লব দমন করেন। কিন্তু চীনা জনগণের মন এই রাজবংশ সম্পর্কে ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে গেল।

॥ বিপ্লবের ফলাফল ॥

যেভাবে ইউরোপীয় সাহায্যে এই বিপ্লব দমন করা হয় তাতে কিছু সংখ্যক চীনের মনে পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্পর্কে আগ্রহ জন্মে। এদের মধ্যে প্রধান হলেন লি-হাং-চাং। তাঁরই চেষ্টায় চীনে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হল, স্টীমারে মাল বহন ও যাত্রী পারাপার আরম্ভ হল, লৌহ কারখানা স্থাপিত হল, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ছাত্রদের অধ্যয়ন আরম্ভ হল। তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে সেনা-বাহিনী গড়তে এবং দেশে রেলপথ স্থাপনেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায় লি-হাং-চাং হলেন আধুনিক যুগের স্রষ্টা।

আধুনিকতার সূচনা

॥ একশত দিনের সংস্কার ॥

জাপানের হাতে চীনের পরাজয় চীনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। যারা প্রাচীনপন্থী তারা এ পরাজয়ে হতবাক, তাদের আত্মবিশ্বাসে চিড় খেল। আর যারা সংস্কারপন্থী তারা পরিষ্কার দাবী করলো জাপানের মত আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করে চীনের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। কাং-ইউ-ওয়ে নামে একজন চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক চীনে পরিবর্তনের জন্য এক বিস্তৃত কর্মসূচী চীন সম্রাট কোয়াং-সুর কাছে পেশ করেন। কোয়াং-সু এই কর্মসূচীতে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন।

কাং-ইউ-ওয়ে

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুন থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একশ' দিন ধরে কোয়াং-সু ঐ কর্মসূচী রূপায়ণের আদেশ দেন। এই কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ, দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ, সম্রাট ও জনগণের মধ্যে সংযোগের জন্য জাতীয় সভা আহ্বান, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় সমিতি নিয়োগ, আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপন, পুরাতন পরীক্ষা ব্যবস্থা বিলোপ, আইন সংস্কারের জন্য কমিশন নিয়োগ, সেনাবাহিনীকে আধুনিক করে তোলা ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সংস্কার

এসব সংস্কারের ফলে চীনের প্রাচীন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। সম্রাট কোয়াং-সু ছিলেন পরলোকগত সম্রাটের বিধবা পত্নী রানী জু-সির দত্তক পুত্র। জু-সি বার্ধক্য হেতু অবসর নিয়ে পুত্রের হাতে শাসনভার অর্পণ করেন। জু-সি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনি কোয়াং-সুর এইসব সংস্কার পছন্দ করলেন না। প্রাচীনপন্থীরা এইবার জু-সির সমর্থন নিয়ে কোয়াং-সুকে বন্দী করে। শাসন ক্ষমতায় আবার ফিরে আসেন জু-সি। এসেই তিনি কোয়াং-সুর সমস্ত সংস্কার নাকচ করে দিলেন। চীনে আবার প্রাচীন ব্যবস্থা ফিরে এল।

প্রতিক্রিয়া

॥ বক্সার বিদ্রোহ ১৮৯৯ ॥

বিচ্ছিন্নভাবে নানা চেষ্টা হলেও চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। বিদেশী রাষ্ট্রের লালসায় চীন ছিন্ন-ভিন্ন। খ্রীষ্টান যাজকদের তৎপরতায় চীনের প্রাচীন ধর্ম বিপন্ন। ইয়াংসির ভয়াবহ বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু। বিদেশী পণ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য মরণাপন্ন। এই ছিল চীনের অবস্থা। দেশবাসীর বিশ্বাস, এমন অবস্থার জন্য দায়ী বিদেশী আক্রমণকারীগণই। ফলে এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনমানস ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কারণ

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে এক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতির সদস্যদের মুষ্টিযুদ্ধ শিখতে হত। বিদেশীরা বলতো মুষ্টিযোদ্ধা বা বক্সারদের সমিতি। এরাই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই এই বিদ্রোহকে বলা হয় বক্সার বিদ্রোহ।

বক্সার সমিতি

বক্সারদের লক্ষ্য ছিল তিনটি। যথা, চীনে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রতিরোধ, বিদেশী জাতির উচ্ছেদ এবং মাঞ্চুশাসনের অবসান। কিন্তু রানী জু-সি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বক্সারদের সমর্থন করায় ওরা মাঞ্চুশাসনের বিরোধিতা বন্ধ করে।

লক্ষ্য

বক্সার বিদ্রোহীরা বহু খ্রীষ্টান যাজক এবং খ্রীষ্টান চীনাকে হত্যা করে। শেষে তারা পিকিং-এ চীনা দূতাবাসগুলো অবরোধ করে। তখন বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো সম্মিলিত ভাবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং বিদ্রোহ দমন করে।

বিদ্রোহ

বিদ্রোহের পর চীন আরও কিছু সুবিধে বিদেশীদের দিতে বাধ্য হয়। যেমন, দশজন পদস্থ চীনা কর্মচারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া, প্রচুর ক্ষতিপূরণ দান, আমদানি শুল্ক কমানো, চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি।

ফলাফল

॥ আবার সংস্কারের উদ্যোগ ॥

বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতা সর্বস্তরে এক হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এমন কি রানী জু-সি পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তব অবস্থাকে আর অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফলে তিনি বাধ্য হলেন কিছু কিছু সংস্কারে উদ্যোগ নিতে।

সেনাপতি ইউ-য়ান-সিকাই-এর নেতৃত্বে সামরিক বিভাগকে শক্তিশালী করে তোলা হল। দেশে আফিমের উৎপাদন ও আমদানি সীমাবদ্ধ করা হল। প্রতিভাবান তরুণদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য পাঠানো আরম্ভ হল। শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হল।

আধুনিক সংস্কার

এর মধ্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বন্দী সম্রাট কোয়াং-সু এবং

রানী জু-সির মৃত্যু ঘটে। সিংহাসনে বসেন হুয়ান-টাং। তিনি ছিলেন অক্ষম, অযোগ্য। ততোধিক অযোগ্য ছিলেন তাঁর পারিষদবর্গ। সুতরাং এইবার মাঞ্চুরাজবংশের অবসানের দিন ঘনিয়ে এল।

॥ **প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব** ॥

কারণ

দেশের অযোগ্য সম্রাট শাসনব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করলেন। তার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা, খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য দেশবাসীকে দিশেহারা করে দিল। পাশাপাশি জাপানের বিস্ময়কর অগ্রগতি চীনাদের সচেতন করে দিল। তারা নিশ্চিত যে, ব্যাপক সংস্কার ব্যতীত চীনের নবজীবন সম্ভব নয়।

এই সময় চীন থেকে বহু ছাত্র জাপানে যেত। এই ছাত্রদের একত্র করে যিনি তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন তিনি হলেন সান্-ইয়াৎ-সেন।

সান্-ইয়াৎ-সেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বহুবার মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হয়ে জাপানে পালিয়ে যান। জাপানে তিনি গড়ে তোলেন একটি সংঘ। এই সংঘের লক্ষ্য হল, জনগণের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র। তাঁর চিন্তাধারা সারা চীনে প্রসারিত হয়ে একটা বিপ্লবী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সান্-ইয়াৎ-সেন

বিদ্রোহের সূচনা

এদিকে মাঞ্চু সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের মতভেদের ফলে দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ সেনাবিভাগেও বিস্তৃত হয়। এই সুযোগে সান্-ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবীগণ নানকিং শহরে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করে। বিদ্রোহীদের দমনে মাঞ্চু সরকার ইউ-য়ান-সিকাই-এর অধীনে সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু ইউ-য়ান বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেওয়ায় মাঞ্চু রাজবংশের অবসান ঘটে।

প্রজাতন্ত্র

এইভাবে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ইউ-য়ান-সিকাই।

॥ **জাপান** ॥

কমোডোর পেরী

চীনের মত জাপানও দীর্ঘকাল নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বহির্জগৎ থেকে। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের যেদিন আমেরিকার নৌ-সেনাপতি কমোডোর পেরী জাপানের বন্দরে গিয়ে নোঙর ফেললেন, সেদিন থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। চীনের মত জাপানেও আসতে লাগলো

বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি, আদায় করতে লাগলো নানা সুবিধে, স্বাক্ষরিত হতে লাগলো নানা অসম চুক্তি।

এইসব অসম চুক্তিতে জাপানে বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিল। দু-এক জায়গায় জাপানীরা বিদেশীদের ওপর আক্রমণও চালালো। কিন্তু এই আক্রমণের জবাবে বিদেশীরা নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে জাপানীদের বুঝিয়ে দেয় যে, অসম শক্তি নিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। লড়তে হলে পাশ্চাত্য ভাবধারাকেই গ্রহণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে।

ইউরোপীয়দের লোভ

কিন্তু বিদেশীদের প্রতিহত করার ব্যাপারে সোগানদের ব্যর্থতায় জাপানে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে সে দেশে ঘটে যায় এক বিরাট পরিবর্তন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সিংহাসনে বসেন মুৎসোহিতো। তাঁর শাসনকাল মেইজি শাসনকাল নামে পরিচিত। কিছু চিন্তাশীল সামন্তের নেতৃত্বে সোগান পরিবার ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়। জাপানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

নতুন সম্রাট নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নেন। এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা তিনি তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন। শাসনব্যবস্থায় তিনি আইন সভার ও জনমতের গুরুত্ব স্বীকার করে নেন এবং জ্ঞান ও যোগ্যতার সন্ধানে তিনি যে কোন স্পর্শকাতরতা পরিহারের সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর শেষ সিদ্ধান্তের ফলেই দ্রুত জাপানে ব্যাপক রূপান্তর আরম্ভ হল। এই রূপান্তরের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: দেশে সামন্ত প্রথা ও সামুরাইগণের বিশেষ সুযোগ-সুবিধে বিলোপ করে জাতীয় ভিত্তিতে জাপানকে পুনর্গঠিত করার রাস্তা খুলে গেল। সামন্ত সৈন্যের পরিবর্তে জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করা হল, সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হল এবং পাশ্চাত্য রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হল। দেশের সর্বত্র রেলপথ, ডাক বিভাগ ও টেলিগ্রাফ স্থাপন করা হল। শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন করা হল। শিক্ষা ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদর্শ গৃহীত হল এবং টোকিও ও কিয়োটোতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হল। ইউরোপীয় আইন কানুনের অনুকরণে নতুন আইন প্রণয়ন করা হল। প্রাশিয়ার আদর্শে দেশে নতুন সংবিধান চালু হল।

আধুনিক সংস্কার

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। জাপানীরা যতই পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করুক না কেন, তারা কিন্তু কখনোই নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দেয় নি। পাশ্চাত্যকে অনুকরণের পেছনেও ছিল তাদের দৃঢ় জাতীয়তাবোধ। এর প্রমাণ হল এখানে যে, কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তারা এশিয়ার একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

জাতীয়তায় আস্থা

॥ **জাপান সাম্রাজ্যবাদের সূচনা** ॥

বিভিন্ন বিদেশী দেশের জাপানের ওপর যে অসম চাপ ছিল, জাপান জানতো তা থেকে অব্যাহতি পাবার একমাত্র উপায় হল নিজের সামরিক শক্তির প্রমাণ দেওয়া। সুতরাং জাপানের পক্ষে এমন কিছু করা জরুরী হয়ে গেল যার মধ্য দিয়ে তার সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া নিজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদা মেটানোর তাগিদেও তার দরকার নতুন ভূখণ্ড দখলের। সুতরাং জাপান এবার সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দিল।

কারণ

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সে চীনের কাছ থেকে আদায় করলো লু-চু দ্বীপপুঞ্জ। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে পেল কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ। এবার তার নজর পড়লো কোরিয়ার দিকে।

॥ **চীন-জাপান যুদ্ধ** ॥

এমনিতেই কোরিয়া ছিল চীন ও জাপানের মাঝখানে, ফলে চীনে রাজ্য বিস্তার করতে হলে কোরিয়া দখল অপরিহার্য। তার ওপর কোরিয়া ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তাছাড়া কোরিয়ার উত্তরে মাঞ্চুরিয়া, কয়লা ও লোহায় পরিপূর্ণ। আর এই কয়লা আর লোহা আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য উপাদান।

কারণ

সুতরাং জাপান কোরিয়া জয়ের জন্য মরীয়া হয়ে উঠলো। তখন কোরিয়া ছিল চীনের অন্তর্গত। ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ লাগলো। পরাজিত হল চীন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিমোনোসেকির সন্ধিতে জাপান পোর্ট আর্থার, লিয়াওটাং উপদ্বীপ, ফরমোসা ও পেসকাডোরেস দ্বীপপুঞ্জ পেল। কোরিয়া অর্জন করলো স্বাধীনতা।

সন্ধি

কিন্তু জাপান এই লাভ পুরোপুরি পেল না। বাধা হয়ে দাঁড়ালো রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানি। চীনের অখণ্ডত্বের অজুহাতে জাপানকে পোর্ট আর্থার ও লিয়াওটাং উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করলো। এতে জাপান স্বভাবতই রাশিয়া বিরোধী হয়ে উঠলো। রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য সে তৈরী হতে লাগলো।

ইউরোপীয়দের বিরোধিতা

॥ **ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি** ॥

চীনে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো ইংলণ্ডও। ফলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও জাপান পারস্পরিক সাহায্যের জন্য মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই চুক্তির ফলে জাপান বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌ-শক্তির সমর্থন লাভ করলো। এতে জাপানের মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে গেল।

গুরুত্ব

॥ রুশ-জাপান যুদ্ধ ॥

ইংলণ্ডের সমর্থনে বলীয়ান হয়ে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং বামনের মত ক্ষুদ্রাকৃতি জাপান দৈত্যের মত বৃহৎ রাশিয়াকে পরাজিতও করলো। পোর্টস মাউথের সন্ধিতে কোরিয়ায় জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হল, লিয়াওটাং জাপান ফিরে পেল এবং রাশিয়া জাপান ও চীনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে স্থির হল।

ফলাফল

এই যুদ্ধ জয়ে জাপানের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। জাপানও নিজশক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে নিল।

গুরুত্ব

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে জাপান পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেল। এই যুদ্ধ জাপানকে তার সাম্রাজ্য-লিপ্সা মেটাবার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। সৌভাগ্যবশত সে জার্মানি বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এ সময়ই জাপান চীনের কাছে তার বিখ্যাত একুশ দফা দাবী পেশ করে। প্রধান দাবীগুলো হল শান-তু ও মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, চীনের বিভিন্ন প্রয়োজনে জাপানী উপদেষ্টা নিয়োগ, চীনের বৃহত্তম লোহ-শিল্পে জাপানের যৌথ উদ্যোগের ব্যবস্থা, ব্যবসাগত দিক থেকে জাপানের প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। চীনের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জাপানের বহু দাবী মেনে নিলেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলো এসব পছন্দ না করলেও যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির জন্য বাধাও দিতে পারে নি।

দাবীপত্র

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

চীন ও জাপানের ইতিহাস যেন দুটি বিপরীত চিত্র। চীন দীর্ঘকাল অন্ধভাবে প্রাচীনপন্থী থেকে বিদেশীদের নির্যাতন সহ্য করেছে। আর জাপান সূক্ষ্ম বাস্তববোধের পরিচয় দিয়ে দ্রুত নিজেকে আধুনিক করে তুলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে নিজেকে রূপান্তরিত করে।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। তাইপিং শব্দের অর্থ কি? এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ছিল? বিপ্লবের ফলাফল কি হয়েছিল?

২। 'একশ' দিনের সংস্কারের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? সংস্কারগুলো কি কি? পরিণতি কি হয়েছিল?

৩। চীনে কিভাবে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় আলোচনা কর।
৪। কিভাবে জাপানে পাশ্চাত্য ভাবধারা এসেছিল বর্ণনা কর।
৫। কোন যুদ্ধ সম্পর্কে দৈত্য ও বামনের লড়াই বলা হয়? ঐ যুদ্ধ কেন হয়েছিল? ঐ যুদ্ধের গুরুত্ব কি?

॥ (খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন** ॥

১। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি সম্ভব হয়েছিল কেন?
২। প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধকে আফিমের যুদ্ধ বলা হয় কেন?
৩। আমেরিকার উন্মুক্ত দ্বার নীতি বলতে কি বোঝায়?
৪। জাপানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল কেন?
৫। জাপানের কাছে কোরিয়া জয়ের গুরুত্ব কি?

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(অ) আফিমের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে— সন্ধির দ্বারা।
(আ) — কেন্দ্র করে আরম্ভ হয় চীন-জাপান যুদ্ধ।
(ই) 'একশ' দিনের সংস্কার রূপায়িত করেন সম্রাট —।
(ঈ) চীনাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন —।
(উ) — মৈত্রী চুক্তি জাপানকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করে।
(ঊ) নৌ-সেনাপতি — আগমন থেকেই জাপানে বিদেশীদের প্রবেশ শুরু হয়।
(ঋ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে জাপান - দাবী চীনের কাছে পেশ করে।
২। সময়ানুক্রম অনুসারে নিচের ঘটনাগুলো সাজাও ঃ
জাপানে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, চীনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব, কমোডোর পেরীর আগমন, তাইপিং বিদ্রোহ, 'একশ' দিনের সংস্কার, জাপানের কোরিয়া জয়, ইঙ্গ-জাপান চুক্তি।
৩। ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ
(অ) তাইপিং বিপ্লবের নেতা ছিলেন সান-ইয়াৎ-সেন।
(আ) 'একশ' দিনের সংস্কার কার্যকরী করেন রানী জু-সি।
(ই) বক্সার বিদ্রোহ হয়েছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে।
(ঈ) ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে।
(উ) রুশ-জাপান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে সিমোনোসেকির সন্ধির দ্বারা।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। মাঞ্চুরিয়াতে কিসের প্রাচুর্য ছিল?
২। একুশ দফা দাবী কে কার কাছে করেছিল?

৩। কোন কোন দেশের বিরোধিতায় জাপান চীন-জাপান যুদ্ধের ফল ভোগ করতে পারে নি ?

৪। আমেরিকা জাপান সম্পর্কে উন্মুক্ত দ্বার নীতি অনুসরণ করেছিল কেন ?

৫। বক্সার বিদ্রোহ বলা হয় কেন ?

৬। বক্সার বিদ্রোহের লক্ষ্য কি কি ছিল ?

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা** ॥

১। তোমরা ইটালীর দেশপ্রেমিক গ্যারিবলডীর সঙ্গে পরিচিত। এখন পরিচয় হল চীনা দেশপ্রেমিক সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে কোথায় মিল কোথায় অমিল খুঁজে বের করো।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

(ক) **১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ :**

(১) অহিফেন যুদ্ধ, নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২) এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তি—টিয়েন সিনের সন্ধি, বন্দর চুক্তি—বিদেশীদের বসতি ও তাদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ—চীনকে খণ্ড খণ্ড করে তার অংশ বিশেষ অধিকারের জন্য বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—হের উন্মুক্ত দ্বার নীতি (১৯০১)।

(২) চীনের প্রতিক্রিয়া—তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩)—শতদিনের সংস্কার (১৮৯৮) —বক্সার বিদ্রোহ—ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর প্রতিক্রিয়া—আভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টা (১৯০২—১৯০৮)—শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি (১৯১১) —প্রজাতান্ত্রিক চীন (১৯১২)—সান-ইয়াৎ-সেন ও ইউ-য়ান-সিকাই।

(খ) বৃহৎ শক্তি হিসেবে জাপানের অভ্যুদয় (১৯১৪) খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—মেইজি যুগে সম্রাটের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)—সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার পাশ্চাত্তীকরণ—চীন-জাপান যুদ্ধের পথে (১৮৯৪—১৮৯৫)—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানী শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়)—রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪—১৯০৫)—কোরিয়া দখল (১৯১০)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্বল চীনের ওপর জাপানের ২১ দফা দাবি।

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

ব্রিটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ

বিষয়-সংকেত :

১৮৫৭-র বিদ্রোহ ইংরেজ ও ভারতীয়দের নিদারুণ আলোড়িত করেছিল। এই আলোড়নে পরিবর্তন এসেছিল দ্রুত গতিতে। এই পরিবর্তনই এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ শাসনের এক সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনব্যবস্থায় কতকগুলো পরিবর্তন অপরিহার্য বলে মনে করলো।

॥ শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন ॥

শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন

প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হল। এখন থেকে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শাসনাধীনে এল। নিযুক্ত হলেন একজন ভারত-সচিব। আর এদেশে দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার জন্য একজন ভাইসরয়।

অন্যান্য ব্যবস্থা

তাছাড়া দেশীয় রাজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভারতীয়রা যেন উচ্চপদে নিযুক্ত হতে না পারে সে পথে বাধার সৃষ্টি করা হল। বিশেষ করে সামরিক বিভাগে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করা হল।

॥ সাম্রাজ্য বিস্তার ॥

সাফল্যের সঙ্গে ভারতের বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজ সরকার ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের সাম্রাজ্য জয়ের ক্ষুধা তখনো মেটে নি।

ব্রহ্মদেশ

ভারতের এক নিকট প্রতিবেশী হল ব্রহ্মদেশ। এই দেশ জয় করতে পারলে চীনের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য করতে সুবিধে হয়। সুতরাং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষিত হল। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মদেশ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হল।

ব্রহ্মদেশের পর ইংরেজদের দৃষ্টি পড়লো আফগানিস্তানের দিকে। এতকাল পর্যন্ত এই দেশ সম্পর্কে তারা নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে চলেছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেওয়ায় তারা আফগানিস্তান দখল করার তাগিদ বোধ করলো। কিন্তু সেখানে শক্তি প্রয়োগে পুরো সাফল্য না পাওয়া গেলেও আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পেয়েছিল ইংরেজরা। এই অধিকার রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিকে প্রতিহত করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট।

আফগানিস্তান

ভারতের আরেক নিকট প্রতিবেশী হল তিব্বত। এখানেও রাশিয়াভীতি ইংরেজদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সুতরাং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে এক অভিযান প্রেরিত হল। অভিযান শেষে স্থির হল, ইংরেজরা তিব্বতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলেও তিব্বত অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেবে না। স্বীকার করতেই হয় তিব্বত অভিযান থেকে ইংরেজদের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নি।

তিব্বত

তিব্বতের পর সিকিম। সিকিমের অবস্থান হল ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী স্থানে। ইংরেজদের ইচ্ছে হল, ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে সিকিমের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকুক। কিন্তু সিকিমে তিব্বতী প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত ইংরেজরা সিকিমের দেওয়ানের সমর্থনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। শেষে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তিতে স্থির হয় সিকিম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ইংরেজদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় না। শেষ পর্যন্ত ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের সঙ্গে এক সন্ধির মাধ্যমে সিকিম ইংরেজদের অধীনস্থ এক দেশে পরিণত হয়।

সিকিম

সিকিমের পর বিরোধ দেখা দেয় ভুটান নিয়ে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধির মধ্য দিয়ে ইংরেজ সরকার ভুটানের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য আভ্যন্তরীণ শাসনে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলো।

ভুটান

এইভাবে প্রত্যক্ষ ইংরেজ শাসনে ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

॥ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী হল ভারতের ইতিহাসে সংস্কারের শতাব্দী। এই সময় এদেশে যেসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন এনেছিল তার উদ্যোক্তা ছিল ভারতীয়রা। অবশ্য ইংরেজরা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করে এই পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কারণ এতকাল ভারতীয় সমাজ-জীবন ছিল অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শন

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল

ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে ক্রমশ ভারতীয়গণ বুঝতে পারলো, কোন বিষয়েই অন্ধত্ব নয়, সব কিছুকেই বিচার করতে হবে যুক্তি দিয়ে, স্বাধীন বিচার বুদ্ধি দিয়ে।

রাজা রামমোহন রায়

ভারতীয়দের মধ্যে এই নতুন চিন্তাধারায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি নিজে জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সতীদাহপ্রথা রোধ এবং বিধবাদের বিবাহে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন উন্নত শিক্ষা ছাড়া এদেশের মানুষের মন থেকে সংস্কার দূর করা যাবে না। তাই তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক। স্বদেশবাসীর আর্থিক দুর্গতির অবসান কল্পে তিনি এদেশের জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার ও চাষীদের দুর্দশা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হেনরী ডিরোজিও নামে এক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী দেশের তরুণ সমাজে নতুন চেতনা জাগ্রত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নিয়ে দেশের যুব সমাজকে সবকিছু যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করবার উপদেশ দিতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ যুব সমাজকে তখন বলা হত ইয়ং বেঙ্গল। তিনি ছাত্র সমাজকে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন।

ইয়ং বেঙ্গল ও ডিরোজিও

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্ব ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় জনজীবনকে সংস্কারমুক্ত হয়ে গতিশীল হতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

ব্রাহ্মসমাজ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারক হিসেবেও বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। ভারতের নারীজাতির মুক্তি আন্দোলনে তাঁর অবদান কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। বিশেষ করে বিধবাবিবাহ প্রচলনে তিনি যে অবিচল মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তাছাড়া নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

বিদ্যাসাগর

মহারাষ্ট্রের মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি গঠন করে মহারাষ্ট্রের সমাজ-জীবনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

রাণাড়ে

সৈয়দ আমেদ

স্যার সৈয়দ আমেদ খান মুসলমান সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আলিগড়ে মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজই এখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। কিন্তু স্যার সৈয়দ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আদৌ দৃষ্টি দেন নি।

সৈয়দ আমেদ

বিবেকানন্দ

আর্যসমাজ ও বিবেকানন্দ

স্বামী দয়ানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মূলত ধর্মসংস্কারক হলেও সমাজ-জীবনে ছিল তাঁদের অপরিসীম প্রভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতীয় সমাজ-জীবনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনসেবার আদর্শ প্রচার করে তিনি দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।

॥ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ॥

কারণ

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারকের প্রচেষ্টায়, ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির নব মূল্যায়নের সুযোগে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ক্রমশ জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র

এই অবস্থায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে জনমানসে স্বদেশ প্রেম উন্মোচিত করেন। তাঁর 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম্' সারা ভারতবর্ষে যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শের কাজ করলো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এর সঙ্গে তদানীন্তন ভারতীয় পরিস্থিতি জাতীয়তাবোধের বিকাশে সাহায্য করলো। দীর্ঘ ইংরেজ শাসন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছিল। দেশে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। সুপরিকল্পিতভাবে ইংরেজরা কখনো এদেশে শিল্প-বিস্তারে

উদ্যোগ নেয় নি। ফলে নানাভাবেই বিদেশী শাসন সম্পর্কে জনচিত্তে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হল আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং সংবাদপত্রের ভূমিকা। বিশাল এই দেশে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ সহজ করে দিয়েছিল। আর তদানীন্তন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তখনকার সংবাদপত্রগুলো জন মানসকে ক্রমশ প্রস্তুত করে তুলছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র

সব মিলিয়ে এতদিনের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ ও বিশ্লেষণ এইবার একটি স্পষ্ট রূপলাভ করবার সুযোগ পেল। এই রূপই ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদে পরিণত হল। আর জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ হল বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে বজ্রকঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একদিনে বা আকস্মিকভাবে হয় নি।

॥ জাতীয় কংগ্রেসের জন্য ॥

ভারতীয় জনগণের যে বিক্ষোভ তাকে একটি সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে নানা জায়গাতেই হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশে গঠিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স।

পূর্ব প্রচেষ্টা

অন্যদিকে ইংরেজরাও ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জনচিত্তের বিক্ষোভ সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হচ্ছিল। তাঁরা চাইছিলেন কোন একটি ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কার্যকরী প্রচেষ্টা দেখা গেল একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ানের তরফ থেকে। তাঁর নাম অ্যালান অকটাভিয়ান হিউম। হিউম দেখলেন যদি ভারতীয়দের নিয়ে এমন একটি সংগঠন গড়া যায় যেখানে ভারতীয়গণ ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারবেন, তাহলে ইংরেজ সরকারও সেই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে পারবে। ফলে জন-বিক্ষোভ প্রশমনের একটি গঠনমূলক পন্থা অনুসরণ করা যাবে। হিউমের এই প্রচেষ্টার পেছনে ছিল তখনকার ভাইসরয় লর্ড ডাভরিণের পরোক্ষ সমর্থন।

হিউমের ভূমিকা

ফলে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে উঠতে বিলম্ব হল না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে জন্ম হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম

প্রথমদিকে কংগ্রেস বিশ্বাস করতো, ইংরেজ শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে। তাই তখন প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পরিবর্তে আবেদন-নিবেদন নীতিতেই বিশ্বাসী ছিল কংগ্রেস। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হল।

নীতি

॥ চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫ – ১৯১৪) ॥

কংগ্রেসের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন, কেবল আবেদন করে ভারতবাসীর হিমালয়-সমান অভিযোগের প্রতিকার হতে পারে না। তাই তাঁরা চাইলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন। বিশেষ করে ইংরেজ সরকারের কাছে ওই সব আবেদন-নিবেদনের কোন মূল্যই ছিল না।

বিরোধের কারণ

তাঁদের এই মনোভাবের বিস্ফারণ ঘটাতে সাহায্য করলো তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের এক সিদ্ধান্ত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বঙ্গদেশ বিভক্ত করার। এই সিদ্ধান্ত রদ করার দাবীতে সমগ্র বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠলো স্বদেশী আন্দোলনে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য বিদেশী দ্রব্য বর্জন। আন্দোলনের চাপেই কার্জন বাধ্য হয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

এই সাফল্য সারা ভারতের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। তখন চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। এঁদের লক্ষ্য ছিল, জাতীয় আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করা।

নেতৃবৃন্দ

বালগঙ্গাধর তিলক মারাঠাদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করতে গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি সরকারকে কোন কর না দেবার আহ্বান জানিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূচনা করেন। এরপর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্লেগ নিবারণের অজুহাতে সরকার পীড়নমূলক পথ নিলে তিলক তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এসময়ই গুপ্ত ঘাতকের হাতে দুই ইংরেজ কর্মচারী নিহত হলে তিলক দেড় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শুধু ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই নয়, পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও তিলক বিরাট অনুপ্রেরণার উৎস।

বালগঙ্গাধর তিলক

অরবিন্দ ঘোষ তাঁর বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সাহায্যে জনমানসে তীব্র উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি সরকারী প্রশাসন যন্ত্র বিকল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন একজন অসাধারণ বক্তা। স্বদেশী মণ্ডলী নামে এক চরমপন্থী সংগঠনে তিনি ছিলেন সংগঠক। স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে তিনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল

বিপিনচন্দ্র পাল

লালা লাজপৎ রায়

লালা লাজপৎ রায় সমগ্র পাঞ্জাব ভ্রমণ করে জনগণকে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য আত্মত্যাগের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের কর্মধারার তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক।

লালা লাজপৎ রায়

যাই হোক চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে কারাদণ্ড দিয়ে ইংরেজ-প্রশাসন কিছু দিনের জন্য চরমপন্থী আন্দোলনের গতিবেগ স্তিমিত করতে পেরেছিল এ কথা ঠিক। কিন্তু সাময়িক এই ব্যর্থতা থেকেই আরম্ভ হয় বাংলাদেশের ব্যাপকতর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

আন্দোলনে ভাঁটা

● এই অধ্যায়ের মূল কথা ●

১৮৫৭-র বিদ্রোহ দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা তাই কালক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করে। এই আন্দোলনকে সুশৃংখল আকার দিতে সৃষ্টি হয় জাতীয় কংগ্রেসের, যদিও প্রথম দিকে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মনোভাব ছিল আপোসমূলক।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) **রচনামূলক প্রশ্ন** ॥

১। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ভারতের শাসনব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন এসেছিল ?

২। কোন বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে ইংরেজদের মনে ভীতি ছিল ? এই ভীতি থেকে তারা ভারতের কোন কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়িয়েছিল ? তার ফলাফল কি হয়েছিল ?

৩। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল কেন এবং কিভাবে ?

৪। চরমপন্থী বলতে কি বোঝায় ? তাঁদের বক্তব্য কি ছিল ? যে কোন একজন চরমপন্থী নেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥ (খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন** ॥

১। কোন শতাব্দীকে ভারতের ইতিহাসে সংস্কারের শতাব্দী বলা যায় ? সংস্কারের তাগিদ এসেছিল কিভাবে ?

২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ
রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র, সৈয়দ আমেদ, বিবেকানন্দ, অক্টোভিয়ান হিউম।

৩। ডিরোজিও কে ছিলেন ? তিনি কি উপদেশ দিতেন ?

৪। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে অর্থনৈতিক অবস্থার কি ভূমিকা ছিল ?

৫। হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন কেন ?

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

অ) আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বনাম হল— ।

আ) দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন — ।

ই) ডিরোজিও-র দলকে বলা হত — ।

ঈ) — ছিলেন অসাধারণ বক্তা।

উ) তিলক — প্রচলন করেন।

ঊ) অরবিন্দ ঘোষ — পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় উদ্দীপনা জাগিয়েছিলেন।

২। 'ক' স্তম্ভের বর্ণনার সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের নামগুলো মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ) বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা	অ) ডাফরিণ।
আ) ইয়ং বেঙ্গলের গুরু	আ) সৈয়দ আমেদ।
ই) মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক	ই) বঙ্কিমচন্দ্র।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ঈ) বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের নায়ক	ঈ) ডিরোজিও।
উ) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরোক্ষ সমর্থক	উ) কার্জন।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। ব্রহ্মদেশ জয়ের পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
২। সিকিম সম্পর্কে ইংরেজদের মনোভাব কি ছিল ?
৩। চরমপন্থী আন্দোলন স্তিমিত হয়েছিল কেন ?
৪। বিবেকানন্দ কি প্রচার করে বেড়াতেন ?
৫। লালা লাজপৎ রায় জাতীয় সংগ্রামে কিসের ওপর গুরুত্ব দিতেন ?

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা** ॥

১। বালগঙ্গাধর তিলক ও অরবিন্দ ঘোষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংগ্রহ করো।
২। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর রাখী বন্ধন উৎসব উদ্যাপন করার উদ্যোগ নাও।
৩। ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ভারতীয় সাম্রাজ্যের পরিধির একটি মানচিত্র দেখাও।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ব্রিটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ (১৮৫৮—১৯১৪)

নতুন শাসনব্যবস্থা—সাম্রাজ্য বিস্তার—উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কার—জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫—১৯১৪)

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

বিষয়-সংকেত ঃ

স্বার্থের সংঘাতে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। নিজের সৃষ্টির সংহারক সে তখন নিজেই। সেই পশুত্বের ভয়াবহতা যে কত ব্যাপক হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জাগরণের ফলে ইটালী ও জার্মানীর মত বহু জাতি ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু এর ফলেই সৃষ্টি হল এক গভীর সংকট। এর আগে রাজায় রাজায় যেমন ছিল ক্ষমতার লড়াই, এবার তেমন আরম্ভ হল জাতিতে জাতিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের কারণ হল প্রত্যেক জাতি-ই চাইলো আরো বেশী সাম্রাজ্য বিস্তার করতে, আরো বেশী উপনিবেশ স্থাপন করতে, আরো বেশী ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। এই সীমাহীন অন্ধ ক্ষমতার লালসা থেকেই নেমে এল মানব সভ্যতার ওপর এক ভয়াবহ অন্ধকার ঘটনা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

পরিস্থিতির পরিবর্তন

॥ বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা ॥

কেবল অস্ত্রবলের ওপর নির্ভর করে ইউরোপের মানচিত্রে জার্মানির আবির্ভাব এক চমকপ্রদ ঘটনা। জার্মান ঐক্যের রূপকার বিসমার্ক কিন্তু এতেই তৃপ্ত হলেন না। তিনি চাইলেন সামরিক শক্তিতে ও শিল্প-বাণিজ্যে জার্মানিকে অপরাজেয় করে তোলা। সুতরাং জার্মানিরও প্রয়োজন হল উপনিবেশ দখলের। চীন ও আফ্রিকাতে জার্মানি তাই উপনিবেশ দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়লো।

জার্মানির ভূমিকা

এর মধ্যে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম বিসমার্ককে সরিয়ে নিজ হাতে জার্মানির দায়িত্ব নিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আরও বেশী আকাশ-ছোঁয়া। তিনি চাইলেন ইংলণ্ডের মত সারা পৃথিবীব্যাপী জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন।

জার্মানির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধিতে অন্যান্য দেশ ভয় পেয়ে গেল। কারণ ইংলণ্ড চাইতো না, জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তৃত হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হোক, নৌশক্তিতে প্রবল হয়ে উঠুক। ফ্রান্স তো প্রাশিয়ার কাছে তার পরাজয়ের কথা ভুলতেই পারে নি। বিশেষ করে তার সীমান্ত প্রদেশ আলাস ও লোরেন জার্মানি দখল করে নেওয়ায় সে ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ।

অন্যান্য দেশের ভূমিকা

রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদ ছিল জার্মানির বন্ধু অস্ট্রিয়ার। কেননা তারা দুজনেই দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল।

এই অবস্থায় সবাই চাইলো নিজ নিজ শক্তি বাড়াতে। সেই অনুসারে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালী পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হল ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স।

॥ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ॥

এইভাবে ইউরোপ দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রয়োজন ছিল শুধু একটি অগ্নিশলাকার। তাও ঘটে গেল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন। বসনিয়ার রাজধানীর রাজপথে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরানী নিহত হলেন। অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলো সার্বিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সার্বিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রাশিয়া। আবার চুক্তি অনুসারে জার্মানিকে যেতে হল অস্ট্রিয়ার সাহায্যে আর ফ্রান্সকে আসতে হল রাশিয়ার সাহায্যে। জার্মানবাহিনী বেলজিয়মে ঢুকতেই বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অজুহাতে ইংলণ্ডও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। আরম্ভ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

বসনিয়ার ঘটনা

চার বৎসরব্যাপী এই যুদ্ধ মানুষের পশু-ভাবের এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান কতখানি সংহার রূপ নিতে পারে তার প্রমাণ এই যুদ্ধ। স্থলে, জলে, আকাশে এমন কি জলের নিচেও ব্যবহারোপযোগী মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হল, ব্যবহৃত হল। এতকাল যুদ্ধ হত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যে। এইবার কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসহায় নিরপরাধ সাধারণ মানুষ যুদ্ধের বলি হল।

যুদ্ধের চেহারা

॥ যুদ্ধের ফলাফল ॥

শেষ পর্যন্ত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভার্সাই শহরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লাভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল।

নতুন রাষ্ট্রের জন্ম

কিন্তু জার্মানির ওপর চরম প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হল। তার সব উপনিবেশ মিত্রশক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল। তার শিল্পাঞ্চল দখল করলো ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। তার সামরিক শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া হল। আলসাস ও লোরেন ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল যুদ্ধের অপরাধে বিপুল অর্থদণ্ড।

ক্লিষ্ট জার্মানি

সুতরাং সন্দেহ নেই, ভার্সাই চুক্তি জার্মানির পক্ষে এক জাতীয় কলঙ্ক হয়ে থাকলো। স্বভাবতই তাই জার্মানি এখন থেকে উদগ্রীব হয়ে থাকলো এই জাতীয় কলঙ্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগের অপেক্ষায়।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যখন ইংলণ্ড এই যুদ্ধে জড়িয়ে যায়, তখন ভারত ইংরেজদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ ভারত

তখনো ইংরেজদের সততা ও ন্যায় বিচারবোধের প্রতি আস্থাশীল ছিল। বিশেষ করে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সহানুভূতিশীল নীতি ভারতীয়দের ইংরেজদের পক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত করেছিল। তারা আশা করেছিল, যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে ইংরেজরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবে।

কারণ

কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনাবলী ভারতীয়দের ইংরেজদের সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। যে প্রত্যাশা তাদের ছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

॥ যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক দুর্গতি ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুদ্রাস্ফীতি ও জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা-পরিসীমা ছিল না। মধ্যবিত্ত চাকুরী-জীবিদের পক্ষে বাঁধা মাইনেতে সংসার চালানোই অসম্ভব হয়ে উঠলো। কৃষিজাত পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে গেল। অন্যদিকে কল-কারখানার মালিকেরা যুদ্ধের সময় উচ্চমূল্যে মাল বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা করে। কিন্তু শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে শ্রমিকদের অসন্তোষও বেড়ে যেতে থাকে। জনসাধারণের এই যে সার্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সেখানে ইংরেজ সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তাই তাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ বেড়ে যেতে লাগলো।

বিপর্যস্ত মানুষ

॥ ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপ ॥

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণমানসে যে বিপ্লবী চেতনার জন্ম হয়েছিল তা ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে ভারতে ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে যায়। দেশের ভেতরে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ দেখা যায় প্রধানত মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাবে।

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলনের জনক ছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফালকে। তিনি সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ইংরেজদের বিতাড়িত করা অসম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর আদর্শে গড়ে ওঠে বিপ্লবী সমিতি। ছত্রপতি শিবাজী হলেন বিপ্লবীদের আদর্শ মুক্তিযোদ্ধা। এই সময় মহারাষ্ট্রে মহামারীর আকারে দেখা দেয় প্লেগ। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডকে হত্যা করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনা যুব সমাজে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। গড়ে ওঠে 'বাল সমাজ' নামে এক যুব সংগঠন। এ ছাড়া 'আর্য বান্ধব সমাজ' নামেও আরেক বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহারাষ্ট্র

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগ্য উত্তরসাধক বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার 'অভিনব ভারত' নামে এক নতুন বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলেন। ইটালী ঐক্য আন্দোলনের

অন্যতম ম্যাৎসিনির আদর্শে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন হয়ে উঠলো তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। সমগ্র মহারাষ্ট্রে অভিনব ভারতের শাখা স্থাপিত হয়। এই সমিতির সদস্যদের হাতে কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তা নিহত হলে ইংরেজগণ কঠোরভাবে এই আন্দোলনও দমন করে। সাভারকার দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত হন। ধীরে ধীরে আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে আসে।

সাভারকার

বাংলার প্রথম বিপ্লবী সংগঠন হল অনুশীলন সমিতি। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বাংলার তারুণ্যে যে উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল তা ক্রমশ তীব্ররূপ ধারণ করে অরবিন্দ ঘোষের সুযোগ্য নেতৃত্বে। তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ এই সময় বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন। তা ছাড়া ব্রহ্মমাধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' ও বিপিনচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। বারীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু, পুলিন দাস প্রভৃতি বিখ্যাত বিপ্লবীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়।

বাংলা

বারীন্দ্রনাথের দলেরই প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু কিংসফোর্ড নামে এক ইংরেজ জজকে হত্যা করার কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু ভুলক্রমে দুই নিরপরাধ ইংরেজ মহিলা নিহত হন। ঘটনাস্থলেই প্রফুল্ল চাকী রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন আর ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। এই ঘটনার সূত্র ধরেই পুলিশ বারীন্দ্রনাথের মানিকতলার বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। পরে বিখ্যাত আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বারীন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এই মামলা সংক্রান্ত ঘটনাবলী সে সময় সারা বাংলায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

আলীপুর মামলা

অন্যদিকে বাঘা যতীন, মানবেন্দ্র রায় প্রভৃতি বিপ্লবীগণ বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই অনুসারে তাঁরা জার্মানি থেকে কিছু সাহায্যও পেয়েছিলেন। বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে লোমহর্ষক যুদ্ধের পর প্রাণ বিসর্জন দেন বাঘা যতীন।

বাঘা যতীন

পাঞ্জাবের সাহারানপুরে স্থাপিত হয় এক বিপ্লবী-সমিতি। সমিতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল হরদয়াল, অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ নামে তিন পাঞ্জাবী যুবকের। বিশেষ করে হরদয়াল এক বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তুললে গ্রেপ্তার এড়াতে লণ্ডনে পালিয়ে যান।

পাঞ্জাব

এ সময় পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর যোগাযোগ হয়। রাসবিহারী চেয়েছিলেন বিদেশী অস্ত্র সাহায্যে ভারতীয় সেনা-বাহিনীকেও বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করে ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘটাতে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি জাপানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

রাসবিহারী বসু

॥ ভারতের বাইরে বিপ্লবী কার্যকলাপ ॥

দেশে যখন বিপ্লবী আন্দোলন যথেষ্ট সক্রিয়, তখন দেশের বাইরে বিপ্লবীগণও আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিল।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ লণ্ডনে 'পদ্ম ও ছুরিকা' নামে এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এরপর শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিং রাণা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে এক বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলেন। এর মধ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনলাল ধিংড়া নামে এক পাঞ্জাবী যুবক স্যার কার্জন ওয়াইলি নামে এক ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজকে লণ্ডনেই হত্যা করেন। মাদার ভিকাজী রোস্তমজী কামা নামে এক পার্শী মহিলা বিদেশে বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করতে বিশেষ অগ্রণী হয়েছিলেন। তাই তাঁকে 'ভারতীয় বিপ্লবের জননী' বলা হয়।

লণ্ডনে বিপ্লবীগণ

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পাঞ্জাবী বিপ্লবী হরদয়াল লণ্ডন থেকে আমেরিকায় এসে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। 'গদর' কথাটির অর্থ হল বিপ্লব। এই পার্টি বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল।

গদর পার্টি

আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ তুরস্ক আক্রমণ করলে মুসলমানেরাও ইংরেজদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কাজী ওবেদুল্লা নামে এক ভারতীয় মুসলমান কাবুলের শাহকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে সামিল হতে আহ্বান জানান। কাবুলে প্রতিষ্ঠিত হয় এক স্বাধীন ভারতীয় বিপ্লবী সরকার।

মুসলমান ক্ষোভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতেই ঘটে এক ঘটনা। কিছু পাঞ্জাবী বিপ্লবী কোমাগাতা মারু নামে এক জাপানী জাহাজে কানাডা যায়। কিন্তু কানাডা সরকার তাদের জাহাজ থেকে নামতে না দেওয়ায় তারা ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা তখন তাদের গ্রেপ্তার করতে না পেরে গুলি করে আঠারো জন যাত্রীকে হত্যা করে। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতবর্ষ শিহরিত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার এক কঠোর মনোভাব তৈরী হয়ে যায়।

কোমাগাতা মারু ঘটনা

॥ হোমরুল আন্দোলন ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিলেও শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত ও তিলক মনে করতেন, যুদ্ধ চলাকালীনও ইংরেজদের কাছে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করা যেতে পারে। এই দাবীতে তাঁরা এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনই 'হোমরুল আন্দোলন' নামে পরিচিত।

আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে ইংরেজরা ভয় পেয়ে যায়। তারা নিরুপায় হয়ে বেশান্ত, তিলক ও তাঁদের সহকারীদের গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারে সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে ইংরেজরা বাধ্য হয় দেশবাসীকে অনতিবিলম্বে শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতে। প্রকৃতপক্ষে হোমরুল আন্দোলনের ফলেই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয়।

প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

॥ লক্ষ্নৌ চুক্তি ॥

ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহা যতই তীব্র হতে থাকে, ততই জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠবে। ফলে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে লক্ষ্নৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্থির হয়, তারা যুক্তভাবে ইংরেজদের কাছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট দিন ঘোষণার দাবী জানাবে।

॥ রাওলাট্ আইন ॥

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার কুখ্যাত রাওলাৎ আইন পাস করে। এই আইনের বলে যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা যেত। এই আইনের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যেত না। ফলে আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়।

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ॥

রাওলাৎ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ জালিয়ান-ওয়ালাবাগে এক সভায় যোগদান করে। স্থানটির তিনদিকে ছিল উঁচু প্রাচীর। একটিমাত্র প্রবেশ পথ। ঐ পথটি বন্ধ করে ইংরেজরা সভায় নির্বিচারে গুলি চালিয়ে প্রায় এক হাজার নারী, শিশুসহ মানুষকে হত্যা করে।

এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। দেশব্যাপী ধিক্কারে আর প্রচণ্ড ক্ষোভে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

॥ মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার ॥

ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাস করা হয়। কিন্তু এই সংস্কার আইন দেশের মানুষের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীকে তৃপ্ত করতে পারে নি। বরং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতিতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা হয়। ফলে পরিস্থিতি অধিকতর ঘোরালো হয়ে ওঠে।

॥ মুসলমানদের অসন্তোষ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা তুরস্কের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হয়। কারণ তুরস্কের সুলতান ছিলেন তাদের ধর্মগুরু বা খলিফা। যুদ্ধের শেষে ইংরেজরা তুরস্কের অধিকাংশ স্থান দখল করে নিলে মুসলমানেরা অধিকতর উত্তেজিত হয়। তারা খলিফার অধিকার রক্ষার দাবীতে খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে তোলে।

খিলাফৎ আন্দোলন

জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের এই দাবীকে সমর্থন জানায়। স্থির হয়, দেশবাসী

ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বরাজ দাবী করবে এবং মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারে বিভেদ সৃষ্টির যে চেষ্টা করা হয়েছে তাকে প্রতিহত করবে।

॥ গান্ধীজী ও অসহযোগ ॥

এইভাবে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দীর্ঘকাল ধরে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ বারুদের স্তূপে পরিণত হচ্ছিল। এমন অবস্থায় প্রয়োজন ছিল এক যোগ্য নেতৃত্বের। আর এক পদ্ধতির যার সাহায্যে সমগ্র দেশবাসীকে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে সামিল করা যায়। নেতৃত্বের এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে জাতির জীবনে আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী। সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ অজানা এক অস্ত্র, নাম অহিংস অসহযোগ, যা সমগ্র দেশবাসীকে সম্মোহিত করলো এবং উদ্বুদ্ধ করলো দেশের শৃঙ্খল ছিন্ন করার এক মহান আদর্শে।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—দেশে ও বাইরে বিপ্লবী কার্যকলাপ, ইংরেজদের দণ্ডনীতি ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা, সম্মিলিতভাবে গান্ধীজীর আবির্ভাব ও তাঁর অসহযোগ নামক অস্ত্র প্রয়োগের পটভূমিকা রচনা করেছিল।

অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?

২। কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

৩। ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। হোমরুল আন্দোলন বলতে কি বোঝ ? এই আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল ?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপ কোন কোন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় ?

২। জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইংলণ্ড ভয় পেয়েছিল কেন ?

৩। ইংলণ্ড কখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত ইংরেজদের সমর্থন করেছিল কেন ?

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনজীবনে কিভাবে অর্থনৈতিক দুর্যোগ এনেছিল ?

৬। লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব কি ?

৭। 'কোমাগাতা মারু' ঘটনা বলতে কি জান ?
৮। রাওলাট্ আইনের মূলকথা কি ?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(অ) —বিসমার্ককে অপসারণ করেন।
(আ) — নগরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
(ই) ভার্সাই চুক্তি — পক্ষে এক জাতীয় কলঙ্ক।
(ঈ) 'গদর' কথাটির অর্থ হল —।
(উ) —'পদ্ম ও ছুরিকা' নামে এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন।
(ঊ) —কে বলা হয় ভারতীয় বিপ্লবের জননী।
(ঋ) গান্ধীজীর রাজনৈতিক পদ্ধতি হল —।
(ঌ) —ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

॥ (ঘ) মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কোন কোন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় ?
২। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের স্বপ্ন কি ছিল ?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্রান্স কোন কোন জায়গা ফিরে পেয়েছিল ?
৪। গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে ?
৫। খিলাফৎ আন্দোলন কাকে বলা হয় ?
৬। কত খ্রীষ্টাব্দে রাওলাট্ আইন পাস হয় ?
৭। হোমরুল আন্দোলনের প্রধান ছিলেন কে কে ?
৮। কোন ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

॥ (ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা ॥

১। বিদ্যালয় থেকে একবার জালিয়ানওয়ালাবাগ পরিদর্শনের পরিকল্পনা রচনা কর।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

কারণ এবং উহার ব্যাপকতা — ফলাফল।

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব

বিষয়-সংকেত

ফরাসী বিপ্লব যেমন জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের উদ্গাতা, রুশ বিপ্লব তেমনি শোষিত মানুষের মুক্তির নিশানা। লক্ষণীয় এই, মানুষের মুক্তির আন্দোলন কোন দেশের নিজস্ব আন্দোলন না থেকে বিশ্ববাসীর আন্দোলনে পরিণত হয়।

ফরাসী বিপ্লব যেমন বিশ্ববাসীকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়েছিল, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব তেমনি সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তাই ফরাসী বিপ্লবের পর বলশেভিক বিপ্লবই সমগ্র পৃথিবীকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে।

॥ বিপ্লবের আগে রাশিয়ার অবস্থা ॥

অন্যান্য দেশের মত রাশিয়াতেও জারের স্বৈরতন্ত্র অভিজাত সামন্তদের সাহায্যে দেশ শাসন করতো। পুলিশ আর সেনাবাহিনী ছিল দেশ শাসনের সহায়ক। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র আর জাতীয়তাবাদ সাফল্য লাভ করছিল রাশিয়ার জারেরা ছিলেন তখনো স্বেচ্ছাচারী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, বহির্বিশ্বের পরিবর্তনের ঢেউ কখনো তাঁদের সাম্রাজ্যকে প্লাবিত করতে পারবে না।

জার শাসন

কিন্তু দেশবাসীর মনে জারের শাসন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ক্রমশ সঞ্চিত হচ্ছিল। সেই বিতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কখনো কখনো। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালে নিহিলিস্ট আন্দোলন পুঞ্জীভূত বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু জারগণ এসব আন্দোলনে সতর্ক হলেন না। আর শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস তো ছিলেন একেবারেই অক্ষম, অযোগ্য এবং দুর্নীতিগ্রস্ত।

জনবিক্ষোভ

রাশিয়ার সামাজিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। দেশে কৃষক ও শ্রমিকের দিন কাটতো শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে। তাদের জন্য কোন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। গাধার খাটুনি তারা খাটতো, বিনিময়ে পেত পশুর মত জীবন। ফলে বিপ্লবীগণ এই শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতে পেরেছিল যে জারের শাসনের অবসান ঘটাতে পারলেই কেবলমাত্র তাদের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

সামাজিক অবস্থা

রাশিয়ায় বিপ্লবী ভাবধারার প্রসারে দেশের সাহিত্যিক-দার্শনিকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। হার্জেন তাঁর রচনায় কর্মজীবন প্রথার প্রশংসা করেন। ডস্টয়েভস্কি তাঁর উপন্যাসে কৃষি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেন। টলস্টয় তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে নতুন আশাবাদ জাগিয়ে তোলেন। আর কার্ল মার্কসের দর্শন রাশিয়ার বিপ্লবীদের নতুন পথ ও কর্মধারার নির্দেশ দিয়েছিল।

দার্শনিকদের ভূমিকা।

জারের বৈদেশিক নীতি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশ গ্রহণ ছিল জনমতবিরোধী। এর ওপর জার্মানির হাতে রাশিয়ার পরাজয় পরিস্থিতিকে উগ্র করে তোলে। আবার যুদ্ধের ফলে দেশে দেখা দিল তীব্র খাদ্যাভাব। জিনিস-পত্রের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেল। সাধারণ মানুষের দিন কাটতে লাগলো প্রায় অনাহারে। এ অবস্থায় বিপ্লবীগণ ঘোষণা করলো যে, তারা দেশের শাসনভার পেলে পরিবর্তে শান্তি স্থাপন করবে। শ্রমিকের জন্য রুটির ব্যবস্থা করবে আর কৃষকের জন্য জমি। এমন আশ্বাস পাবার জন্যই তখন দেশের লোক ব্যাকুল। ফলে বিপ্লবীদের আশ্বাসবাণীতে লোকের মনে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি হল। সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধের অবসানের আশায় বিপ্লবীদের সমর্থন জানালো।

জারের বিদেশনীতি

॥ বিপ্লবের সূচনা ॥

এই অবস্থায় বিপ্লবীগণ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিকদের ধর্মঘট আহ্বান করলো। শ্রমিকেরা শহরের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে যে সেনাদল পাঠানো হল সেই সেনাদল তাদের ওপর গুলি-বর্ষণ করতে অস্বীকার করে। তখন শ্রমিক ও সেনাদলের মিলিতভাবে কমিউন বা সোভিয়েট স্থাপন করলো। পেট্রোগ্রাড শহরের এই ঘটনা দ্রুত অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে যায়।

পেট্রোগ্রাডের ঘটনা

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ডাকেন। এই সভার অধিকাংশ সভ্যই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই শ্রেণীর চাপে নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই সরকারের প্রধান ছিলেন কেরেনেস্কি।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

॥ বলশেভিক বিপ্লব ॥

ঘটনা যত দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে ঘটছিল তাতে বিপ্লবীরাও হতচকিত হয়ে যান। বিশেষ করে তাদের প্রাণপুরুষ লেনিন ছিলেন দেশের বাইরে।

মেধাবী ছাত্র লেনিন ছাত্র-জীবনেই মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকার গঠন সম্ভব। তাই

সংগঠিত করেন বলশেভিক দল। কিন্তু জার সরকারের চাপে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

লেনিন

পরে দেশে বিপ্লবের খবর পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং চরম সংকটকালে নেতৃত্বভার তুলে নেন। কেরেনেস্কি সরকারের ব্যর্থতায় বলশেভিকগণ এই সরকার মেনে নিতে রাজী হল না। তারা চাইল এই সরকারের পতন ঘটাতে। তাদের নেতা লেনিন তখন দেশে ফিরে এসেছেন।

লেনিন ঘোষণা করলেন একই সঙ্গে জার ও মধ্যবিত্তদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। বলশেভিকগণ ধ্বনি তুললেন সব ক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে দিতে হবে। এদিকে কেরেনেস্কি সরকারের ক্ষমতাও ছিল রাজধানীতে সীমাবদ্ধ। লেনিন সরকারের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগান। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পেট্রোগ্রাড শহরের অনুসরণে সোভিয়েট গড়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বলশেভিকগণ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর কেরেনেস্কি সরকারকে উচ্ছেদ করে সরকারী ক্ষমতা দখল করে। সম্পূর্ণ হল বলশেভিক বিপ্লব। নভেম্বর মাসে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল বলে এই বিপ্লবকে 'নভেম্বর বিপ্লব'-ও বলা হয়।

বলশেভিক বিপ্লব

॥ বিপ্লবের প্রভাব ॥

বলশেভিক বিপ্লবের ভাবধারা পৃথিবীর সকল দেশকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, পৃথিবীর সকল কৃষক, শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষের কাছে এই ভাবধারা মুক্তির এক নিশ্চিত আশ্বাস। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যেমন অভিজাততন্ত্রের ওপর আঘাত, তেমনি রাশিয়ার বিপ্লব ধনতন্ত্রের ওপর আঘাত।

নিপীড়িতদের আশা

দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী সরকার যেভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে রাশিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তাও আজকের পৃথিবীর অনুন্নত বা উন্নতিকামী দেশগুলোর অনুকরণযোগ্য।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

তৃতীয়ত, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য যেসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রাশিয়ায় গৃহীত হয়েছে, তাও আজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের কর্মধারা কেমন হওয়া উচিত, তার এক চমৎকার উদাহরণ সোভিয়েট রাশিয়ার সরকার।

শ্রমিকের উন্নতি

সর্বশেষে আজকের পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার যে ব্যাপক গ্রহণ-যোগ্যতা তাও সম্ভব হয়েছে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। সমাজবাদকে যে আর আজ অগ্রাহ্য করা যায় না তার পেছনে রাশিয়ার বিপ্লবী সরকারের অসাধারণ ভূমিকা। তবে আজকের পৃথিবীতে আদর্শ হিসেবে সমাজবাদ সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকলেও এই আদর্শকে রূপায়িত করার পথ নিয়ে রয়েছে মত পার্থক্য।

সমাজবাদী চিন্তাধারা

● এই অধ্যায়ের মূল কথা ●

রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি বৈজ্ঞানিক পথের সন্ধান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আজকের পৃথিবী যেভাবে প্রভাবিত, তার পেছনেও এই বিপ্লবের অবদান যথেষ্ট।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। বলশেভিক বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়ার অবস্থা কেমন ছিল বর্ণনা কর।

২। বলশেভিক বিপ্লব কিভাবে পরবর্তী সময়কে প্রভাবিত করেছে আলোচনা কর।

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রসারে সেখানকার সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের কি ভূমিকা ছিল?

২। কোন শহরে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল এবং কিভাবে?

৩। জারের বৈদেশিক নীতি কিভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

রুশ বিপ্লব

কারণ—ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের ওপর উহার প্রতিক্রিয়া।

———

চতুর্দশ অধ্যায়

ইউরোপ

(১৯১৯–১৯৩৯)

বিষয়-সংকেত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় মানুষ একদিকে যেমন শান্তির সন্ধানী হয়ে ওঠে, অন্যদিকে জাতিগত দম্ভ তাকে আরেকবার রক্তাক্ত অন্ধকার গহ্বরের দিকে ঠেলে দেয়।

দীর্ঘ চার বছর তিনমাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ধ্বংসলীলা চলার পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয়। এইবার চললো বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

॥ প্যারিসের শান্তি বৈঠক ॥

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩২টি দেশের প্রতিনিধিগণ প্যারিস শহরে মিলিত হলেন। দীর্ঘ আলোচনার দু'শ পৃষ্ঠার খসড়া সন্ধিপত্র রচিত হল। ঈষৎ পরিবর্তনের পর এই সন্ধিপত্রই স্বাক্ষরিত হয় ভার্সাই-এর প্রাসাদে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে।

সন্ধিপত্র

যুদ্ধ থামার আগেই আমেরিকার তখনকার রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন কোন জাতি অন্য কোন জাতির ওপর আধিপত্য করতে না পারে। তাহলে যুদ্ধের কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সন্ধিপত্র এমনভাবে রচিত হল যে, তাতে ইউরোপের মানচিত্রই পাল্টে গেল।

মূল নীতি

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ইটালীয় প্রধান অঞ্চল ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হল। হাঙ্গেরী স্বাধীনতা লাভ করলো। প্রাচীন বোহেমিয়ার জায়গায় তৈরী হল চেকোশ্লোভাকিয়া। পোল্যাণ্ড এতকাল বিভক্ত ছিল অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে। এই পোল্যাণ্ড এবার স্বাধীনতা পেল। ফ্রান্স ফিরে পেল তার আলসাস ও লোরেন। আসল কথা জার্মান ও অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল। জার্মানিকে তার উপনিবেশগুলো থেকে বঞ্চিত করা হল। কিন্তু উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা না দিয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল।

মানচিত্রে পরিবর্তন

শান্তি বৈঠকে ইউরোপের পুনর্গঠনের লক্ষ্যই ছিল জার্মানিকে এমন ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া যেন সে ভবিষ্যতে আর কোনদিন প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে না পারে।

লক্ষ্য

॥ ইটালীতে ফ্যাসিবাদ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে ইটালীর যত ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ হয় নি প্যারিসের শান্তি বৈঠকে। ফলে ইটালীর জনগণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে দেশে উৎপাদন কমে যায়, দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। মানুষের জীবনে এক বিরাট অর্থ-নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। সরকারের দিক থেকেও এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ-নির্দেশ না থাকায় ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ ও কৃষক বিক্ষোভ দেখা যায়।

যুদ্ধোত্তর অবস্থা

দেশের এই বিক্ষুব্ধ ও বিশৃংখল অবস্থায় জমিদার, শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত সমাজ সবাই চাইছিল একটি সুদক্ষ স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা। সৈন্যবাহিনীও একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

এমন অবস্থাতেই ফ্যাসিজম্-এর উত্থানের পথ তৈরী হয়ে যায়।

বেনিতো মুসোলিনি ছিলেন ফ্যাসিজ্ম-এর প্রবক্তা। তিনি তাঁর সমর্থকদের সামরিক কায়দায় গড়ে তোলেন। প্রাচীন রোমের কনসালগণ ক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে Fasces বা প্রতীক ব্যবহার করতো। এই প্রতীক মুসোলিনি তাঁর দলের জন্য গ্রহণ করেন। এর থেকেই তাঁর দলের নাম হয় ফ্যাসিস্ট। দলের কর্মীদের পোশাকের রং ছিল কালো।

মুসোলিনি

মুসোলিনি

গুণ্ডামি করেই ফ্যাসিস্টগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দেয়। শেষে সুযোগ বুঝে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর দেশের শাসনভার দখল করেন মুসোলিনি ও তাঁর ফ্যাসিস্ট দল। নীতি হিসেবে মুসোলিনি ঘোষণা করেন দেশে আইন ও শৃংখলার প্রতিষ্ঠা, আর্থিক উন্নতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা, বিশ্বসভায় ইটালীর মর্যাদা বৃদ্ধি—এগুলোই হল ফ্যাসিস্ট দলের লক্ষ্য। কিন্তু কর্ম পদ্ধতিতে মুসোলিনি পুরোপুরি একনায়কতন্ত্রী। যে কোন রকমের বিরোধিতা কোনক্রমেই বরদাস্ত করা হত না।

ক্ষমতা দখল ও নীতি

॥ জার্মানিতে নাৎসীবাদ ॥

স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মানিতে দেখা দিল গভীর হতাশা ও ব্যাপক অরাজকতা। পরাজয়ের জ্বালায় জর্জরিত কাইজার হল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন। দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সেই সময়কার জার্মানির সংকট দূর করা

সম্ভব ছিল না। বিশ্বযুদ্ধ জার্মানির নৈতিক শক্তিকেই কেবল বিধ্বস্ত করে দিয়ে যায় নি, নিজ দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডটাকেই ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বাধ্য হওয়া জার্মানিকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। দেশের এই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতেই হিটলার ও তাঁর নাৎসী দলের উৎপত্তি।

যুদ্ধোত্তর অবস্থা

যুদ্ধের পর হিটলার গড়ে তোলেন তাঁর নাৎসী দল। দলের কর্মসূচী হিসেবে ঘোষিত হয় ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী অগ্রাহ্য করা ও সমস্ত জার্মানদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠন করা। আর একাজ যেহেতু সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় করা সম্ভব নয়, সেহেতু গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র গ্রহণ করতে হবে, যে ব্যবস্থায় দল ও দলনেতার নির্দেশ অন্ধভাবে মেনে চলা হবে। নাৎসী দল বিশ্বাস করতো জার্মান জাতিই শ্রেষ্ঠ জাতি এবং পৃথিবী শাসন করা হল এই জাতির জন্মগত অধিকার।

হিটলার

জ্বালাময়ী ভাষণের মধ্য দিয়ে হিটলার জার্মান জাতির মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলেন। হতাশাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে নতুন আশার আলো তিনি জ্বেলে দেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পরই নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য ইহুদি ও কমিউনিস্টদের ওপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করেন। নির্বাসন, গ্রেপ্তার, গোপন হত্যা—কোন পথই তিনি বাদ দেন নি নিজে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে।

ক্ষমতা দখল

এইভাবে জার্মানিতে একমাত্র ক্ষমতাবান পার্টি হল নাৎসী পার্টি এবং এই পার্টির একমাত্র নেতা হলেন হিটলার।

মুসোলিনি ও হিটলারের আদর্শ ও কর্মধারা ছিল একই রকমের। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে উভয়েই নিজ নিজ দেশে শান্তি শৃংখলা স্থাপন করেছিলেন, অর্থনৈতিক সংকট দূর করতে পেরেছিলেন, দেশকে নতুনভাবে সামরিক দিক থেকে সজ্জিত করে তুলেছিলেন। ফলে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরী হল না। এশিয়াতেও তাঁরা এক বন্ধু পেয়ে গেল। জাপানেও ইটালী ও জার্মানির ধরনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একনায়কতন্ত্র এবং চলছিল জোর সামরিক প্রস্তুতি। জাপানও তাদের সঙ্গে মিলিত

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

হল। জার্মানি, ইটালী ও জাপান এই তিন শক্তির সম্মেলনে বিশ্বের আকাশে ঘনিয়ে এলো আরেক বিপদের ঘন কালো মেঘ।

॥ জাতিসংঘ ঃ সাফল্য ও ব্যর্থতা ॥

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন এক প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাব ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রে গৃহীতও হয়।

সেই প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হয় লীগ অফ্ নেশন্স বা জাতিসংঘ। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয় যুদ্ধের পরিবর্তে আপোস ও আলোচনার দ্বারা সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা।

গঠন

কতকগুলো আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। যেমন তুরস্ক ও ইরাকের সীমানা বিবাদ, যুগোশ্লাভিয়া আলবানিয়া আক্রমণ করতে গেলে যুগোশ্লাভিয়াকে থামানো, গ্রীস বুলগেরিয়া আক্রমণ করলে গ্রীসকে অপরাধী সাব্যস্ত করা, জার্মানি ও পোল্যাণ্ড, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড, সার্বিয়া ও আলবানিয়া প্রভৃতির বিবাদ মীমাংসা করা। তাছাড়া অস্ত্র-বৃদ্ধিরোধে জেনেভা প্রোটোকল নামে এক চুক্তিপত্র রচনা, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর নৌ-শক্তি বন্ধ করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তাদের নিজ নিজ সীমানা মেনে চলতে বাধ্য করা, বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা প্রভৃতি কাজেও জাতিসংঘ যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

সাফল্যের ক্ষেত্র

কিন্তু জেনেভা প্রোটোকলে ইংলণ্ডকে যুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া থেকেই জাতিসংঘের ব্যর্থতা আরম্ভ হয়। পরে জাপান চীন আক্রমণ করলে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় থাকে। বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে জার্মানি বেরিয়ে যায়। ইটালী দখল করে আবিসিনিয়া। জার্মানিও অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। অর্থাৎ বৃহৎ শক্তিগুলো যে সব বিষয়ে জড়িয়ে যায় সেখানেই জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে জাতিসংঘের আর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

ব্যর্থতার ক্ষেত্র

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল যেন আরেক সংকটের প্রস্তুতিকাল। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলো এই সময়টাকে ব্যবহার করেছে আরেক পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে। একনায়কতন্ত্রী শাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদই ছিল এই সংকটের মূলে।

॥ অনুশীলনী

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। প্যারিসের শান্তি বৈঠকের মূলনীতি কি ছিল? কিভাবে এই বৈঠকে ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তন করা হল?
২। ফ্যাসিবাদের উৎপত্তির আগে ইটালীর অবস্থা কেমন ছিল? ফ্যাসিবাদের মূল নেতা কে? ফ্যাসিবাদের নীতিগুলো কি কি?
৩। জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল কেন? কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সফল হয়েছিল? কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসোলিনি ও হিটলার উভয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন?
২। বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উইলসন কি বলেছিলেন?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির অবস্থা কেমন ছিল?

॥ গ) মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হয় কবে? শান্তি বৈঠক বসেছিল কোথায়? শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কোথায়?
২। মুসোলিনি তাঁর দলের জন্য কোন প্রতীক গ্রহণ করেছিলেন?
৩। নাৎসী দলের প্রধান কর্মসূচীগুলো কি কি?

॥ ঘ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা ॥

১। ভার্সাই-এর সন্ধির পরবর্তীকালে পুনর্গঠিত ইউরোপের একটি মানচিত্র অংকন করো।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ইউরোপ (১৯১৯—১৯৩৯)

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন এবং ইউরোপের পুনর্গঠন—ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব—জাতিসংঘ—উহার সাফল্য ও ব্যর্থতা।

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

বিষয়-সংকেত

ক্ষমতার লিপ্সা মানুষকে এমন বিচার-বিবেক-বুদ্ধিহীন করে তোলে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মাত্র একুশ বৎসর না যেতেই আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এবারের যুদ্ধ আরও বেশী ভয়াবহ, রক্তক্ষয়ী এবং প্রাণান্তকারী।

জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলেও সেটা যেমন ছিল উপলক্ষ মাত্র, তেমনি জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের উপলক্ষ মাত্র। আসলে প্রস্তুতি চলছিল ঠিক করে বলতে গেলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের মুহূর্ত থেকেই।

যুদ্ধ আরম্ভ

প্রথমত, ভার্সাই সন্ধিতে যেভাবে জার্মানিকে উপেক্ষা ও অসম্মান করা হয়েছিল জার্মানিগণ কখনোই তা মেনে নিতে পারে নি। বিজয়ী পক্ষের আচরণে জার্মানির প্রতি যে প্রতিশোধমূলক মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছিল তা ছিল জার্মানির পক্ষে জাতীয় কলংক। সুতরাং এই কলংক অপনোদনের অপেক্ষায় থাকলো জার্মানি। প্রকৃতপক্ষে জার্মানির মর্মবেদনাকে উস্কে দিয়েই হিটলার জার্মানির একচ্ছত্রাধিপতি হতে পেরেছিলেন। তিনি তো পরিষ্কার ঘোষণাই করেছিলেন অপমানজনক ভার্সাই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে জার্মানির লুপ্ত মর্যাদা ফিরিয়ে আনাই তাঁর লক্ষ্য। আর এ কাজ শক্তি পরীক্ষা ব্যতীত সম্ভব ছিল না।

জার্মানির জ্বালা

দ্বিতীয়ত, প্যারিসের শান্তি বৈঠকে যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি বলে বিক্ষুব্ধ ছিল ইটালীও। পরবর্তীকালে মুসোলিনিও হিটলারের মত ইটালীর সম্পদ ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে যুদ্ধকে অপরিহার্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন। জার্মানি ও ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এশিয়ার উদীয়মান শক্তি জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা। ফলে, এই তিনশক্তির সম্মেলনে বিশ্বে আরেক ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হতে বিলম্ব হল না।

ইটালী ও জাপানের উচ্চাশা

তৃতীয়ত, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া অন্যদিকে ও তাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লভ্যাংশ অটুট রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর নতুন নতুন দেশে আধিপত্য বিস্তারের নেশাও তাদের অস্থির করে তুলেছিল। ঠিক এ অবস্থায় যখন জার্মানি, ইটালী ও জাপান ঐক্যবদ্ধ হল; তখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে জোট বন্ধন হতে বিলম্ব হল না। এইভাবে পৃথিবী আবার যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল।

মিত্রশক্তি গঠন

চতুর্থত, ভার্সাই সন্ধির মূল নীতিই ছিল প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নেওয়া। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এই নীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি। তার কারণ তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারতো। ফলে, বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিক্ষোভ জমে উঠতে থাকে। যেমন, অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করার সুযোগ পেয়ে যান। এমন কি তাঁর পোল্যাণ্ড আক্রমণের পেছনেও অজুহাত ছিল সংখ্যালঘু জার্মানদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

সংখ্যালঘু জাতির ক্ষোভ

পঞ্চমত, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর পর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে সংকট কেবল ঘনীভূত হল মাত্র। আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসংবাদ মেটাতে জাতিসংঘ গঠিত হলেও কার্যক্ষেত্রে এই সংঘের অপদার্থতা প্রমাণিত হয়ে গেল। ১৯৩১-এ জাপান যখন চীন আক্রমণ করলো, কিংবা ইটালী যখন ১৯৩৫-এ ইথিওপিয়া ও ১৯৩৬-এ আলবানিয়া দখল করলো কিংবা ১৯৩৮-এ যখন জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে নিল তখন সবাই বুঝে গেল জাতিসংঘ কত অক্ষম, কত অসহায়। সুতরাং পরবৎসর জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

॥ যুদ্ধের প্রকৃতি ॥

ছয় বৎসরব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থায়িত্ব যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে তা যেন মানবসভ্যতার এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। এই ছয়টি বৎসর বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় কেবল মারাত্মক মারণাস্ত্র আবিষ্কারে, যার চূড়ান্ত পরিণতি জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। কেবল এ দুটি জায়গাতে কত নিরপরাধ লোক প্রাণ দিয়েছে তারই হিসেব মেলানো যায় না।

যুদ্ধের বিভীষিকা

॥ যুদ্ধোত্তর পৃথিবী ॥

এক সময় এই যুদ্ধের অবসান হল ঠিকই, তথাপি বিশ্বশান্তির আশা এখনো দুরাশা। যুদ্ধের পরেই দেখা গেল বিজয়ী পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ। যারা একদা পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার তাদিগে একত্র হয়েছিল, তারাই অল্পদিনের মধ্যেই প্রয়োজন মিটে যাওয়ায় পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তাই যুদ্ধকালীন দুই বন্ধু আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে আজকের ঠাণ্ডা লড়াই বিশ্বপরিস্থিতিকে সর্বদাই তটস্থ রেখেছে। তাই দু'দেশের নেতৃত্বে আজকের পৃথিবী প্রায় দ্বিধাবিভক্ত।

দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবী

তবে এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবী থেকে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে। ভারতবর্ষের মত বহুদেশ যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতা লাভ করে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের অবসান

যুদ্ধের আণবিক বোমার বিস্ফোরণ মানুষকে বিজ্ঞানের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। আণবিক অস্ত্র সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী এক তীব্র জনমত তৈরী হলেও প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কেননা এখনো চলেছে একইভাবে আণবিক অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা, যদিও মানুষ ভাল করেই জানে, বহু যুগ ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা বহু সাধনার এই মানুষের সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পক্ষে এই সব সঞ্চিত অস্ত্র এখনই যথেষ্ট।

বিজ্ঞানের ভূমিকা

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের সংঘাতের পরিণতিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্যাপকতার দিক থেকে এই যুদ্ধ অনেক বেশী ভয়াবহ, লোকক্ষয়ী এবং সর্বনাশা। অথচ এসব সত্ত্বেও এখনো মানুষের চৈতন্য হয় নি। তাই দেখি এখনো অস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো বর্ণনা কর।
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে আজকের পৃথিবীকে প্রভাবিত করছে ?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভে জার্মানির ভূমিকা কি ছিল ?
২। জাতিসংঘের ব্যর্থতা কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী করে দিয়েছিল ?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
অ) জার্মানি—আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।
আ) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে — চীন আক্রমণ করে।
ই) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী দখল করে —।
ঈ) — ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ তৈরী করে দেয়।

॥ (ঘ) মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। ইটালীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে মুসোলিনী কি অপরিহার্য মনে করতেন ?
২। কোথায় প্রথম আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয় ?
৩। আজকের পৃথিবী কোন কোন দেশের নেতৃত্বে বিভক্ত ?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

কারণ ও ফলাফল।

———

॥ ষোলড় অধ্যায় ॥

স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতবর্ষ

বিষয়-সংকেত

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মানব সভ্যতার এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এক অভিনব পন্থার যুগান্তকারী অনুসরণই হল সেই সংগ্রামের প্রাণশক্তি। এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ই এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা ভারতবর্ষে ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। প্রত্যাশা ছিল, যুদ্ধ শেষে এদেশের জাতীয়তাবাদ যথেষ্ট মর্যাদা পাবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক মন্দা তীব্ররূপ ধারণ করলো। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিল্পে সংকট, বেকার শ্রমিক, দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষক, শহরে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার—সব মিলিয়ে সে এক চরম দুর্যোগের সময়।

অর্থ নৈতিক সংকট

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জাতীয়তাবাদকেই সঞ্জীবিত করেছিল। ভার্সাই সন্ধিতে বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃতি পেলেও ভারতের মত বহুদেশে এই নীতি হয়েছিল উপেক্ষিত। ফলে এই সব দেশে ক্ষোভ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

ভার্সাই সন্ধির নীতি

তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতি সম্পর্কে যে সম্ভ্রমের মনোভাব ছিল তা ভেঙ্গে দিয়েছিল। কেননা দুই বিবদমান পক্ষ পরস্পরের সম্পর্কে এমন কুৎসা রটনা করেছিল যে সেখানে তৃতীয় পক্ষের কোন শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। ভারতেও ইংরেজ জাতি সম্পর্কে মনোভাবে ঘটেছিল এক বিরাট পরিবর্তন।

পাশ্চাত্য শক্তির মর্যাদা হ্রাস

এ অবস্থায় রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তির সৃষ্টি করেছিল। দেখা গেল যদি নিরস্ত্র কৃষক আর শ্রমিকেরা মিলিত হয়ে রাশিয়ার প্রবল-প্রতাপান্বিত জার-শাসনের অবসান ঘটাতে পারে, তা হলে অন্য দেশে এমন ঘটাও সম্ভব।

রাশিয়ার বিপ্লব

ফলে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরাট এলাকা জুড়ে এক নতুন গণচেতনার সৃষ্টি হল। ভারতবর্ষও ছিল এই সব দেশের শরিক।

উত্তপ্ত পৃথিবী

॥ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার ॥

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার ঘোষিত হল। এই সংস্কারের ভিত্তিতেই লিপিবদ্ধ হয় ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন। এই আইনে ভারতীয়দের দেশশাসনে অধিকতর ভূমিকা স্বীকৃত হলেও তা দেশের জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৮-র বোম্বাই অধিবেশনে এই সংস্কারকে হতাশাব্যঞ্জক বলে ঘোষণা করলেন।

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া

॥ রাওলাট্ আইন ॥

এমন অবস্থায় ১৯১৯-এর মার্চে ইংরেজ সরকার রাওলাট্ আইন পাস করলেন। এই আইন সরকারকে বিনা বিচারে যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখার অধিকার দিল। সন্দেহ নেই, আইনের উদ্দেশ্যই ছিল দেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় সচেতনতাকে খর্ব করা। সুতরাং এমন আইনের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়াই ছিল স্বাভাবিক।

উদ্দেশ্য

॥ মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ॥

রাওলাট্ আইনের বিরুদ্ধে জনমানসে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সুসংবদ্ধ এবং সুশৃংখল রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বলিষ্ঠ জাতীয় নেতার। সেই প্রয়োজন মেটাতেই জাতির জীবনে আবির্ভূত হলেন জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধী তাঁর আফ্রিকায় প্রবাসকালে সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান পেয়ে যান। সেই পথ হল সত্য ও অহিংসার ওপর নির্ভরশীল সত্যাগ্রহ। তিনি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন।

গান্ধীজী

তিনি তাঁর নতুন পথের প্রথম সফল প্রয়োগ করেছিলেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের চম্পারণ জেলার নীল-চাষীদের দাবী নিয়ে আন্দোলনকালে। তারপর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিক বিরোধে, গুজরাটের খয়রার কৃষক আন্দোলনেও গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সফল হয়।

এই সব বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী বুঝেছিলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে না পারলে আন্দোলনে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নেই। সবাইকে সামিল করার এই সুযোগ তাঁর সামনে এনে দিল রাওলাট্ আইন।

গান্ধীজীর লক্ষ্য

রাওলাট্ আইন সারাদেশে এক অভুতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করলো। সারাদেশ হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ আর মিছিলে মুখর হয়ে উঠলো।

॥ সরকারী প্রতিক্রিয়া ও জালিয়ানওয়ালাবাগ ॥

গণবিক্ষোভ যত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে ততই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে ইংরেজ সরকার। তাদের এই মনোভাবের নগ্ন প্রকাশ ঘটলো জালিয়ানওয়ালাবাগে, যা আধুনিক ইতিহাসের এক মর্মান্তিক কলংকময় ঘটনা। পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে সাধারণ মানুষ সেদিন ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে সমবেত হয় বন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে। ওই বাগের তিন দিক ছিল প্রাচীরে ঘেরা, একটি মাত্র প্রবেশ পথ। ওই প্রবেশ পথ আটকে দিয়ে নৃশংস ইংরেজ সরকার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মানুষের ওপর রাইফেল ও মেশিনগান দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালালো। হাজার হাজার মানুষ নিহত হল।

কলংকময় অধ্যায়

সারা দেশে ঘটনার ভয়াবহতা এক আতংকের পরিবেশ সৃটি করলো। দেশের লোকও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভয়াবহতার পরিচয় পেয়ে গেল। তারা নৃশংসতার নগ্নতায় আঁৎকে উঠলো। রাগে ক্ষোভে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন।

প্রতিক্রিয়া

॥ অসহযোগ আন্দোলন ॥

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল, স্বরাজ অর্জন না করা পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলবে। অসহযোগের অর্থ হল, সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ, সরকারী বিচার বিভাগ বর্জন এবং সরকারী আইন সভা বর্জন।

অর্থ

১৯২১ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারত প্লাবিত হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে। একদিনে জাতীয় কংগ্রেস প্রকৃত রাজনৈতিক গণসংগঠনে পরিণত হল। দলে দলে ছাত্রসমাজ সরকারী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করলো। তাদের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে উঠতে লাগলো জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন, জামিয়া মিলিয়া ইস্‌লামিয়া, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন আচার্য নরেন দেব, জাকীর হোসেন, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি মনীষিগণ। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো আরম্ভ হল। খাদি বস্ত্র হল জাতীয়তাবাদীদের পোশাক।

বিস্তৃতি

আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী প্রশাসনও নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে লাগলো। লাঠি চালনা, গুলি চালনা, গ্রেপ্তার সাধারণ ঘটনায় পরিণত হল। এ সময়ে ভারত ভ্রমণে এলেন ইংলণ্ডের যুবরাজ। বোম্বাইয়ে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

সরকারী প্রতিক্রিয়া

১৯২১-র এলাহাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সম্ভাব্য জায়গায় আইন অমান্য অন্দোলন সংঘটিত করতে আহ্বান জানালো। আন্দোলন যখন তুঙ্গে ঠিক এই সময় উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা থানা আক্রমণ করে বাইশ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। গান্ধীজী এ ঘটনায় হতচকিত হয়ে যান। তিনি ভাবলেন, জনগণ তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। সুতরাং তিনি আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের বারদৌলি কংগ্রেস অধিবেশনে সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল।

অন্দোলন প্রত্যাহার

অসহযোগ আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই আন্দোলন ভারতের নিভৃত প্রান্তেও বিস্তৃত হয়েছিল। জনগণ ভয়-ভীতি দূর করে সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছিল। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি অর্জন করেছিল।

জনগণের প্রস্তুতি

জহরলাল নেহরু

আবার এই আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল নানাভাবে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ ছিল। বিশেষ করে জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণ কর্মীদের নতুন ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে তাঁরা নেমে পড়লেন।

দেশের নানা স্থানে দেখা গেল শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন। উত্তর প্রদেশে রায়ত আইন পরিবর্তনের দাবীতে, গুজরাটে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষকগণ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। অন্যদিকে খড়্গপুরে রেল কর্মীগণ, জামসেদপুরে টাটা স্টিলের শ্রমিকগণ, বোম্বাই-এর কাপড় কলের শ্রমিকগণ ধর্মঘটের সামিল হয়। সংগঠিত হল শ্রমিক সংগঠন।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতাতেই নতুন করে আরম্ভ হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ভগৎ সিং এক পুলিশ অফিসারকে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাংলাদেশে সূর্যসেনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদীগণ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করে নেন। বিপ্লবী যতীন দাশ জেলে তেষট্টি দিন অনশন করার পর প্রাণ বিসর্জন দেন। এলাহাবাদে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াইয়ে মারা যান। সূর্যসেনেরও ফাঁসি হয়। আবার বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

॥ সাইমন কমিশন ॥

এই অবস্থায় নিযুক্ত হয় ভারতে শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন। কিন্তু এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য ছিল না। ফলে কংগ্রেস এই কমিশন বর্জন করে। যেদিন কমিশন ভারতে এসে পোঁছায়, সেদিন সারা ভারতে হরতাল পালিত হয়।

॥ পূর্ণ স্বরাজের দাবী ॥

লাহোর কংগ্রেস

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মসূচী রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় গান্ধীজীকে।

॥ আইন অমান্য আন্দোলন ॥

দাণ্ডি যাত্রা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই মার্চ বিখ্যাত দাণ্ডি যাত্রার মধ্য দিয়ে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। আরেকবার দ্রুত গতিতে সারাদেশ ভেসে গেল আন্দোলনের জোয়ারে। সারা দেশব্যাপী আরম্ভ হল হরতাল, মিছিল, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, করদান বন্ধ প্রভৃতি। লক্ষণীয় হল, এবারের আন্দোলনে বিশাল সংখ্যায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ।

আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল সরকারী নির্যাতন। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ নব্বুই হাজারেরও বেশী লোক গ্রেপ্তার হল, কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হল।

গোলটেবিল বৈঠক

কিন্তু ইংরেজ সরকার গোলটেবিল বৈঠক ডাকলে গান্ধীজী আবার এই দুর্বার আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হন। নানা বাকবিতণ্ডার পর করাচী অধিবেশনে কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে সম্মত হয়। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আবার আরম্ভ হয় আন্দোলন। সরকারও এবার আন্দোলন ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। শুধু নির্যাতনই নয়, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি নষ্ট করতে তারা আরম্ভ করলো নানা ষড়যন্ত্র। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে কংগ্রেস বাধ্য হল আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে।

॥ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ॥

সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রচিত হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন। এই আইনেই ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়।

সেই অনুসারে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। কংগ্রেস এই নির্বাচনে এগারটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তাদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। কেননা শাসন কার্যের মূল ক্ষেত্রগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। তবুও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তারা সাধারণ মানুষের উপকারের চেষ্টা করেছিল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন

॥ সমাজবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ॥

এই সময় ভারতে সমাজবাদী চিন্তাধারা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লাহোর অধিবেশনে জহরলাল সমাজতন্ত্রকেই ভবিষ্যৎ ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের ভেতরে সমাজবাদীগণ গঠন করলেন আচার্য নরেন দেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি।

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি

এ সময় থেকে বহির্ভারতের ঘটনাবলীতে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী ॥

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রার্থনা করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করলো যে, তারা ফ্যাসীবাদ বিরোধী হলেও পরাধীন অবস্থায় থেকে কিভাবে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে? ফলে এদেশে পাঠানো হল ক্রিপ্‌স মিশন। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তান্তরিতকরণের দাবীতে অচল থাকায় এই মিশন ব্যর্থ হল।

ক্রিপ্‌স মিশন

সুতরাং কংগ্রেস বাধ্য হল পরাধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্য আরেক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।

॥ ভারত ছাড় আন্দোলন ॥

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো। এই সিদ্ধান্তই হল 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত। গান্ধীজী দায়িত্ব নিলেন আরেকবার দেশব্যাপী অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলার।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরদিনই গান্ধীজীসহ দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন। নেতৃবৃন্দের এই গ্রেপ্তার সংবাদ দেশব্যাপী যেন বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করলো। উন্মত্ত ক্রোধে ফেটে পড়লো জনসাধারণ। কোন নেতা নেই, কোন সংগঠন নেই, অথচ দেশবাসী আরম্ভ করলো নিজেদের বিচার বুদ্ধি মত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। সরকারও যতটা সম্ভব নির্যাতনে অমানুষ হয়ে উঠলো। জনগণও যা কিছু সরকারী তার ওপর মারমুখী হয়ে উঠলো। বহু ক্ষেত্রে জনগণের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল সরকারী প্রশাসনকে একেবারে উৎখাত

প্রকৃতি ও বিস্তৃতি

করে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সবাই সর্বান্তঃকরণে যুক্ত হল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার এই সুবর্ণসুযোগে। অন্তত দশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল এই আন্দোলনে কেবল পুলিসের গুলিতে।

ভারত ছাড় আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর এমন ব্যাপক বিদ্রোহ আর ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় নি। এদেশে জাতীয়তাবোধ যে কতটা অন্তর্ভেদী তার প্রমাণ ভারত ছাড় আন্দোলন।

॥ সুভাষ বসু ও আজাদ হিন্দ বাহিনী ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন সুভাষচন্দ্র বসু। দীর্ঘকাল ভারতের তারুণ্যের প্রতীক নেতাজী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে ক্রমশ উপলব্ধি করেছিলেন কেবল অহিংস নীতিতে ভারতে স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সশস্ত্র আঘাত হানতে তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেশত্যাগ করে সোভিয়েট রাশিয়াতে যান সাহায্যের আশায়। কিন্তু জুন মাসে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করলে তিনি বুঝতে পারেন, রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্যের আশা নেই। তাই তিনি চলে আসেন জার্মানিতে। সেখান থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তিনি রওনা হন জাপানের পথে, উদ্দেশ্য জাপানের সহযোগিতায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা। সিঙ্গাপুরে তিনি গঠন করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। এ কাজে তাঁর বিশেষ সহায়ক ছিলেন প্রবীণ দেশত্যাগী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়গণ। তাছাড়া মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে জাপান যেসব ভারতীয়দের যুদ্ধবন্দী হিসেবে দখল করেছিল সেসব ভারতীয়গণও। সুভাষ বসু এদের 'জয়হিন্দ' মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। আর তাদের লক্ষ্যের নির্দেশ দেন 'দিল্লী চলো' নিশানায়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকেরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো তারা একদিন সত্যসত্যই নেতাজীর নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গড়তে সক্ষম হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

বাহিনী গঠন

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পরাজয় মেনে নিতে হয়।

কেবল নিজের ব্যক্তিত্ব আর প্রবল আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে সুভাষচন্দ্র একদিন

অজানা পথের পথিক হয়েছিলেন।' আর শেষ পর্যন্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন তাঁর বুকভরা দেশপ্রেমের অবিনশ্বর পরিচয়। তাই যিনি একদা সামান্য সেনাবাহিনীর নেতাজী ছিলেন তিনি আজ আসমুদ্র হিমাচলের স্বপ্নের নেতাজী হয়ে জনগণের মনে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন।

॥ ব্যাপক গণবিক্ষোভ ॥

বিশ্বযুদ্ধের শেষে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দী সৈনিকদের বিচার নিয়ে ভারতে যে তুমুল জনমতের সৃষ্টি হয়, তার চাপে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়েছিলেন বন্দীদের মুক্তি দিতে।

সামরিক বিভাগে বিদ্রোহ

কিন্তু এরপর সামরিক বাহিনীতে বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহ, বিমানবাহিনীর ধর্মঘট, দিল্লী ও বিহারে পুলিশের ধর্মঘট ইংরেজ সরকারকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। তাছাড়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ে ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট, আগস্টে দক্ষিণ ভারতে রেলকর্মীদের ধর্মঘট এবং হায়দরাবাদ, বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কৃষক আন্দোলন সামগ্রিক অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছিল। এ অবস্থায় ইংরেজ সরকারকে ভাবতে হল ক্ষমতা হস্তান্তরিতকরণের কথা।

॥ স্বাধীনতা লাভ ॥

যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক তখনই আরম্ভ হল কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের ভেতর মতবিরোধ। সেই সঙ্গে সারাদেশ ব্যাপী আরম্ভ হল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠলো। সুতরাং অবস্থা সামাল দিতে প্রস্তাব এল বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার। জাতীয় নেতৃবৃন্দ তখন আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ে বিচলিত আতংকিত। তাই তাঁরা সেদিন মেনে নিলেন বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হল একটি নতুন স্বাধীন দেশের। তার নাম ভারত যার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন আর সুমহান।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

গান্ধীজী তাঁর অহিংসার মন্ত্রে উদ্দীপিত করে আসমুদ্র হিমাচলকে সামিল করেছিলেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে। আর সুভাষচন্দ্র বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র প্রয়াস নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানতে। তাই একজন জাতির জনক আর অন্যজন জাতির নেতাজী।

অনুশীলনী

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন গতিবেগের সৃষ্টি হয়েছিল কেন আলোচনা কর।

২। জাতীয় আন্দোলনের কোন সময় গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়েছিল? তাঁর মূলমন্ত্র কি ছিল? কিভাবে তিনি তাঁর কর্মধারার সূচনা করেন?

৩। কোন ঘটনাকে আধুনিক ইতিহাসের কলংক বলে চিহ্নিত করা যায়? ঘটনাটি বিবৃত কর।

৪। 'অসহযোগ' আন্দোলনের অর্থ কি? এই আন্দোলন কিভাবে বিস্তৃত হয়েছিল? এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াই বা কি হয়েছিল?

৫। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কখন এবং কেন? এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, রাওলাট আইন, সাইমন কমিশন, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, আজাদ হিন্দ বাহিনী।

২। রাশিয়ার বিপ্লব কিভাবে জাতীয়তাবাদীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল?

৩। কোন ঘটনায় গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন? আন্দোলন প্রত্যাহারের পেছনে তাঁর বক্তব্য কি ছিল?

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টি-ভংগী কি ছিল?

৫। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেন কেন? তিনি কোন দেশের সাহায্যে কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। নিচের বাক্যগুলো ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ

(অ) গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ আদর্শের প্রথম প্রয়োগ করেন গুজরাটে।

(আ) গুজরাটে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বালগঙ্গাধর তিলক।

(ই) লাহোর কংগ্রেসে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঈ) নাগপুর কংগ্রেসে জহরলাল সমাজতন্ত্রকে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) জাতীয় কংগ্রেস—সংস্কারকে হতাশাব্যঞ্জক বলে ঘোষণা করেন।

(আ বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকারই হল— আইন।

(ই) নেতাজী—সহযোগিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের চেষ্টা করেন।
(ঈ) কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন —।
(উ) ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয় —আগস্ট।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর প্রতিটি প্রশ্নের পাশে বন্ধনীর ভেতর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করো ঃ

(অ) সত্যাগ্রহ গান্ধীজী প্রথম প্রয়োগ করেন কোথায় ?
(চম্পারণে, আমেদাবাদে, গুজরাটে)।

(আ) জাতীয় আন্দোলন জনগণকে সামিল করার সুযোগ গান্ধীজী পেয়েছিলেন কোন ঘটনায় ?
(মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে, রাওলাট আইনে, ক্রিপস মিশনে)।

(ই) জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া গড়ে উঠেছিল কখন ?
(আইন অমান্য আন্দোলনকালে, অসহযোগ আন্দোলনকালে, ভারত-ছাড় আন্দোলনকালে)।

॥ (খ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। জাতীয় কংগ্রেস প্রকৃত গণসংগঠনে পরিণত হয় কখন ?
২। জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন ?
৩। কোন প্রবীণ বিপ্লবী বিদেশে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন ?
৪। সুভাষচন্দ্র প্রথম কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন ?
৫। বোম্বাই-এ বিখ্যাত নৌ-বিদ্রোহ হয়েছিল কত খ্রীষ্টাব্দে ?

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা** ॥

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখে আসবার জন্য একটি ভ্রমণসূচী প্রণয়ন করো।
২। ভারত ছাড় আন্দোলনের ওপর নাটক বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে অভিনয় করার ব্যবস্থা করো।
৩। গান্ধীজী ও নেতাজীর মূল্যবান নির্দেশাবলী সংকলন করার চেষ্টা করো।
৪। বিদ্যালয়ে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করো। বিতর্কসভার বিষয় হবে ঃ সভার মতে কেবল অহিংস নীতিতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নি।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

ভারতবর্ষ (১৯১৯—১৯৪৭)

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর —অসহযোগ আন্দোলন — কৃষক শ্রমিকের অংশগ্রহণ—আইন অমান্য আন্দোলন — 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—আজাদ হিন্দ ও গণমনে উহার প্রতিক্রিয়া—ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতালাভ।

॥ সপ্তদশ অধ্যায় ॥

চীনে বিপ্লব

বিষয়-সংকেত

আজকের দুনিয়াতে এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে চীনের উত্থান খুব সহজে সম্ভব হয় নি। এর জন্যে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক চড়াই-উৎরাই। এই বাধাবিঘ্ন জয় করার কাহিনী এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ প্রজাতন্ত্রে বিভাগ ॥

ক্ষমতার লিপ্সা

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর চীনে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রেসিডেণ্ট হন ইউ-য়ান-সিকাই। কিন্তু আসলে তিনি প্রজাতন্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন না। বরং বিশ্বাস করতেন কঠোর স্বৈরশাসন ছাড়া দেশের অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। তাই তিনি সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে দেশে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল প্রজাতন্ত্রীদের। তা ছাড়া তিনি নিজেকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাপানের সঙ্গে অপমানজনক সন্ধি করেন। এ অবস্থায় প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষে তাঁকে আর মেনে নেওয়া সম্ভব হল না।

কুয়োমিন তাঙ গঠন

নিরুপায় হয়ে সান-ইয়াৎ-সেন গঠন করলেন কুয়োমিন তাঙ নামে একটি দল। শুধু তাই নয়, চীনের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে ক্যাণ্টন শহরে এক পাল্টা সরকার গড়লেন। আর চীনের উত্তরাঞ্চল নিয়ে পিকিং সরকার থাকলো ইউ-য়ান-সিকাইয়ের নেতৃত্বে। এইভাবে নবীন প্রজাতন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

॥ সামরিক গোষ্ঠীর কলহ ॥

দেশের অবস্থা

ইউ-য়ানের মৃত্যু হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু উত্তর চীনে উপযুক্ত নেতার শূন্যতা সৃষ্টি করলো। এই সুযোগে প্রাদেশিক সামরিক শাসক নিজ নিজ ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। ফলে দেশের সংহতি নষ্ট হল, দেশের অর্থনীতির সংকট আরও ঘনীভূত হল, আর সাধারণ মানুষ এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়লো।

॥ সান-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিন তাঙ দল ॥

অন্যদিকে সান-ইয়াৎ-সেন দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও শোষণমূলক বৈদেশিক

চুক্তিগুলো নাকচ করতে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য নেন। কারণ সোভিয়েট রাশিয়াও ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের বিরোধী। এই দেশের কুয়োমিন তাঙ দলের শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব হল এবং সামরিক বাহিনীতেও পরিবর্তন হল। কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ করার আগেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

সোভিয়েট সাহায্য

॥ সান-ইয়াৎ-সেনের শিক্ষা ॥

মৃত্যুর আগে সান-ইয়াৎ-সেন একখানি গ্রন্থে তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থা লিপিবদ্ধ করে যান। এর নাম জনগণের ত্রি-নীতি। এই তিন নীতির প্রথমটি হল, জাতীয়তা অর্থাৎ সমগ্র চীনে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে তোলা। দ্বিতীয়টি হল, গণতন্ত্র অর্থাৎ দেশের শাসনে জনগণের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। আর তৃতীয়টি হল, শোষণ মুক্তি অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের শোষণ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। তাঁর এই আদর্শ পরবর্তীকালে সান-ইয়াৎ-সেনের একমাত্র মূলমন্ত্রে পরিণত হয়।

তিনটি জন-নীতি

॥ কুয়োমিন তাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি ॥

চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই। সান-ইয়াৎ-সেন যখন সোভিয়েট সাহায্যে কুয়োমিন তাঙকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলছিলেন, তখন কমিউনিস্টদেরও ঐ দলে যোগ দেবার অধিকার দেওয়া হয়। সে-সময় দেশ গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। তাই দেশের প্রয়োজনে তখন প্রজাতন্ত্রী ও কমিউনিস্টগণ একযোগে কাজ করছিলেন।

সম্প্রীতির সময়

॥ চিয়াং-কাই-সেকের নীতি ॥

সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিন তাঙ-এর নেতৃত্ব লাভ করেন সানের অনুচর মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক। তিনি ক্ষমতালোভী সামরিক প্রশাসকদের দমন করে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু এর অল্প দিনের মধ্যেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তীব্র রূপ ধারণ করে। ততদিনে কমিউনিস্টগণ মাও-সে-তুং, চু-তে প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে দেশের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছে। তারা দাবী করলো, দেশ থেকে জমিদারদের আধিপত্যের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু চিয়াং অভিজাতদের পক্ষ সমর্থন করলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠলো।

চিয়াং-কাই-সেক

॥ ঐতিহাসিক 'লং মার্চ' ॥

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং কমিউনিস্টগণকে দল থেকে বহিষ্কৃত করেন। তখন একদল কমিউনিস্ট মাও-এর নেতৃত্বে কিয়াং-সি-হুনান অঞ্চলে ঘাটি তৈরী করে। এখানেই গড়ে ওঠে 'রেড আর্মি' নামে কমিউনিস্ট সামরিক বাহিনী। এই বাহিনী এই অঞ্চলে জমিদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করে এক ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করে। সুতরাং এই অঞ্চলে বার বার সামরিক অভিযান চালান চিয়াং।

কারণ

এই রকমই এক অভিযানকালে রেড আর্মি পরাজয় নিশ্চিত জেনে কিয়াং সি পরিত্যাগ করে বিখ্যাত ৬০০০ মাইলের দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করে। তিনশ' সত্তর দিন পর তারা সেন-সি প্রদেশে নতুন আস্তানা স্থাপন করে। চৈনিক বিপ্লবীদের কাছে এই ঘটনা এক বিরাট অনুপ্রেরণা।

॥ সিয়াং-ফুর ঘটনা ॥

এ অবস্থায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে কমিউনিস্টগণ বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধে কুয়োমিন তাঙ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। তাদের এই প্রস্তাব কুয়োমিন তাঙ সেনাবাহিনীতেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু চিয়াং বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা থেকে কমিউনিস্ট দমনেই অধিক গুরুত্ব দেন। ফলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সেন-সি প্রদেশের রাজধানী সেন-ফু আসেন তখন তাঁকে তের দিন আটক রাখা হয়। এই ঘটনাই জাপানের বিরুদ্ধে চিয়াং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র তৈরী করে। সোভিয়েট রাশিয়াও চীনকে যথেষ্ট অস্ত্র সাহায্য দিতে রাজী হয়। এর মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপান ছিল আমেরিকা ও চীন উভয়ের শত্রু। সুতরাং চীনে জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে আমেরিকাও চীনকে প্রচুর সামরিক সাহায্য দিতে রাজী হয়ে যায়।

চিয়াং আটক

পুনরায় সম্প্রীতি

॥ কুয়োমিন তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ॥

কুয়োমিন তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল খুবই সাময়িক। জাপানকে প্রতিহত করার সুযোগ নিয়ে উত্তর চীনের বিশাল এলাকা জুড়ে কমিউনিস্টগণ নিজেদের প্রভাব বাড়াতে পেরেছিল। কুয়োমিন তাঙ সরকার তাদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ আতংকিত হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চীনে আরম্ভ হল কুয়োমিন তাঙ সরকার ও কমিউনিস্টদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ।

কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

বিশ্বযুদ্ধ শেষে চেষ্টা হয়েছিল, যুদ্ধ-ক্ষত চীনের উন্নয়নে কমিউনিস্ট ও

কুয়োমিন তাঙ-এর যুক্ত সরকার গড়ার। কিন্তু নীতিগত প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেওয়ায় এই চেষ্টা সফল হয় নি। সুতরাং প্রশ্ন এবার পরিষ্কার ঃ চীনের কর্তৃত্বে থাকবে কারা—কুয়োমিন তাঙ না কমিউনিস্ট ? এ প্রশ্ন মীমাংসা করতে গৃহযুদ্ধ হয়ে উঠলো অপরিহার্য।

বিরোধের কারণ

প্রায় দীর্ঘ দু-বৎসর ব্যাপী স্থায়ী গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষেই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রচুর। গৃহযুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারক যুদ্ধটি হয়েছিল সুচাউর কাছে হাওয়াই নদীর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে। এই যুদ্ধে পর্যুদস্ত কুয়োমিন তাঙ সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। চিয়াং দেশত্যাগ করে তাই-ওয়ান দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন। আর চীনে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট সরকার।

চিয়াং-এর পলায়ন

মাও-সে-তুং

লক্ষণীয় হল, চীনে কমিউনিস্টদের এই সাফল্য মার্কসীয় দর্শন অনুসারে শ্রমিক বিদ্রোহ আসে নি কিংবা মাও-বাদ অনুসারে কৃষক বিদ্রোহেও সংঘঠিত হল না, বরং সাফল্য এল সামরিক শক্তিকে ভিত্তি করে।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

সান-ইয়াৎ-সেনের অনুচরগণ তাঁর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হলেন। চীনের জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে তাঁরা যথেষ্ট মনোযোগ দিলেন না। তাঁদের এই ব্যর্থতা এবং অক্ষমতা চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে দিল।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। চিয়াং-কাই-সেকের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মত বিরোধ দেখা দেয় কিভাবে ?

২। ইউ-য়ান-সিকাই কি চেয়েছিলেন ? তাঁর ব্যর্থতা চীনকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল ?

॥ (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ॥

১। সান-ইয়াৎ-সেনের তিনটি নীতি কি কি ?

২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ লং মার্চ, সিয়াং-ফুর ঘটনা।

৩। কুয়োমিন তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণ কি ?

॥ (গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর : (অ) সান-ইয়াৎ-সেন—সাহায্যে কুয়োমিন তাঙকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। (আ) —নেতৃত্বে চীনে প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। (ই) —আক্রমণের সুবাদে কমিউনিস্ট ও কুয়োমিন তাঙ-এর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

॥ (ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন** ॥

১। সান-ইয়াৎ-সেনের প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কি ?
২। চীন প্রজাতন্ত্র দু'ভাগে বিভক্ত হয় কখন ?
৩। কোন দেশ সান-ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করেছিল ?
৪। চিয়াং-কাই-সেক চীন থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেন ?

॥ (ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা** ॥

১। সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনের আর চীনে মাও-সে-তুং-এর অবদান নিয়ে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করো।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯)

ইউ-য়ান-সিকাই ও সান-ইয়াৎ-সেনের অন্তর্কলহে প্রজাতন্ত্রে ভাঙন—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ানের মৃত্যু—তু-চুনদের (যোদ্ধৃগোষ্ঠী) কবলে চীন—সান-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিন তাঙ (জাতীয়াবাদী দল)—তাঁর তিনটি মৌলিক নীতি—৪ঠা মের আন্দোলন—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু—কুয়োমিন তাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (১৯২১—১৯২৪)—চিয়াং-কাই-সেকের দমনমূলক নীতি—উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টদের ৬০০০ মাইল দীর্ঘ অভিযান—১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সিয়াং-ফু ঘটনা—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হতে চীনের ওপর জাপানী আক্রমণ—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে মিলিত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কুয়োমিন তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা—চিয়াং ও তাঁর কুয়োমিন তাঙ দল চীন হতে ফরমোজায় (তাইওয়ান) বহিষ্কৃত—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাও-এর নেতৃত্বাধীন চীনের মূল ভুখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

———

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব

বিষয়-সংকেত

ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রতিবাদ তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচয় ॥

গঠন

আজকের ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ নিয়ে ভারতের পূর্বে, চীনের দক্ষিণে এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে যে বিশাল অঞ্চল, তাই হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ব্রহ্মদেশ ও মালয়েশিয়ার ওপর ইংরেজদের, কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামে ফরাসীদের এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের প্রাধান্য ছিল।

গুরুত্ব

ভৌগোলিক দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগকারী এই অঞ্চল এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যেও সেতুবন্ধন করেছে। স্বভাবতই ভৌগোলিক অবস্থিতির কারণেই পৃথিবীর সকল বৃহৎ শক্তি এই অঞ্চলে নিজ নিজ প্রভাব বাড়াতে বিশেষ আগ্রহী। তাছাড়া প্রকৃতির অকৃপণ দানে চাল, রবার, সিংকোনা, মশলা প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এটাও লুব্ধ দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করার কম আকর্ষণ নয়।

॥ ইন্দোচীন ॥

আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন, লাওস, কাম্বোডিয়া, টংকিং, আন্নাম ও কোচিন চীন নিয়ে গঠিত ছিল। এই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকে আরম্ভ হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আন্দোলন তীব্ররূপ নিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অঞ্চল জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পতনের প্রাক্কালে

জাপান এখানে আন্নামের ভূতপূর্ব শাসক বাও ডাইয়ের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম নামে একটি স্বাধীন দেশের সৃষ্টি করে যায়।

কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার দাবীতে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে আন্নামের কমিউনিস্টগণ ভিয়েতমিন নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতমিন ভিয়েতনামকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের দ্যগল সরকার ভিয়েতনামকে ফ্রান্সের অধীনস্থ একটি স্বয়ংশাসিত দেশে পরিণত করার চেষ্টা করলে ভিয়েতমিনের সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে যায়। অন্যদিকে কাম্বোডিয়া ও লাওস ফ্রান্সের অধীনে থাকতে রাজী হলে সেখানে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

ভিয়েতনাম সংকট

ফ্রান্স বাও ডাইকে সামনে রেখে ভিয়েতমিনকে চূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা সম্মেলনে ভিয়েতনামকে দ্বিধা বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে দুটি নতুন দেশের জন্ম হয়। সেই সঙ্গে এই অঞ্চল থেকে ফরাসী প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

জেনেভা সম্মেলন

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ছিল ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি অংশ। কিন্তু ঐ বৎসর ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। অবশ্য ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ব্রহ্মদেশে ছিল তীব্র বিক্ষোভ। তাই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করলে এবং সেখানে স্বাধীনতাদানের অঙ্গীকার করলে ব্রহ্মবাসী জাপানীদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু জাপান যখন তার অঙ্গীকার রক্ষায় অগ্রসর হল না তখন ব্রহ্মদেশে আরম্ভ হল জাপান বিরোধী বিক্ষোভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ব্রহ্মদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করলো। ইংরেজরাও এ দাবী মেনে নিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রহ্মদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

জাপানের অধিকার

স্বাধীনতা

॥ মালয়েশিয়া ॥

আজকের মালয়েশিয়া মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বোর্ণিও অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই জায়গাগুলো ছিল ইংরেজদের অধিকৃত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মালয় উপদ্বীপে ইংরেজ কর্তৃত্বের অবসান হয় এবং গঠিত হয় মালয় যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রে সিঙ্গাপুর ছিল না। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমান প্রথম মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব দেন। সিঙ্গাপুর এই প্রস্তাব সমর্থন করে। বোর্ণিও প্রভৃতি দেশও এই প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করে। সুতরাং এই সব দেশকে মিলিত করে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হল মালয়েশিয়া।

ফেডারেশন গঠন

॥ ইন্দোনেশিয়া ॥

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইন্দোনেশিয়া বলতে বোঝাতো সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানকে। এই অঞ্চলে ছিল ওলন্দাজদের আধিপত্য। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই এ অঞ্চলে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে। এখানকার জাতীয়তা আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল জাপানের অধিকারে চলে যায়। কিন্তু জাপানের পতনের মুহূর্তে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় নেতা সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। ওলন্দাজগণ কিন্তু এটা মেনে নিতে রাজী হল না। ফলে এ অঞ্চলে দেখা দিল এক ঘোর সংকট। শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চেষ্টায় এবং বিশ্বজনমতের চাপে ওলন্দাজগণ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

সুকর্ণ

● এই অধ্যায়ের মূল কথা ●

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এনেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। এই সব দেশের জাগ্রত জনমতের চাপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বাধ্য হয় তাদের দীর্ঘ দিনের শাসন ও শোষণের অবসান ঘটাতে। দেশগুলো হল ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কাম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম প্রভৃতি।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ (ক) রচনামূলক প্রশ্ন ॥

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে কোন কোন দেশগুলোকে বোঝায়? বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে এই অঞ্চল কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ?
২। আজকের ভিয়েতনাম কিভাবে জন্ম নিল আলোচনা কর।

॥ খ ॥ সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ঃ

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রহ্মদেশ জাপানকে স্বাগত জানিয়েছিল কেন? তার ফলাফল কি হয়েছিল?
২। ভিয়েতনামের সঙ্গে ফরাসী সরকারের বিরোধের কারণ কি?
৩। মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাবক কে? কোন কোন দেশ এই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়? কত খ্রীষ্টাব্দে মালয়েশিয়া গঠিত হয়?

॥ (গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(অ) ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সংগঠন হয় তার নাম— ।

আ) —সম্মেলনে ভিয়েতনামকে দু'ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ই) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংগ্রাম—জাতীয় সংগ্রাম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

(ঈ) —ইন্দোনেশিয়াকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করেন।

২। নিচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ

(অ) হো-চি-মিনের নেতৃত্বে মালয়ে তীব্র জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

(আ) সুকর্ণ মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

(ই) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চেষ্টায় ব্রহ্মদেশ স্বাধীন দেশে পরিণত হয়।

(ঈ) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় মালয়েশিয়া।

॥ (ঘ) মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। কোন কোন দেশ নিয়ে ইন্দোচীন গঠিত ছিল ?

২। ইন্দোচীনে কাদের আধিপত্য ছিল ?

৩। ভিয়েতনাম সংগঠনের প্রধান সংগঠক কে ছিলেন ?

৪। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল ?

॥ (ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা ॥

১। আজকের দিনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি মানচিত্র এঁকে তাতে বিভিন্ন দেশের অবস্থান নির্দেশ কর।

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া।

———

॥ ঊনবিংশ অধ্যায় ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী

বিষয়-সংকেত

পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ আজ শান্তির পিয়াসী। তার সঙ্গে চলেছে সবরকম শোষণ বন্ধ করে জীবনে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

॥ দেশে দেশে জাতীয় চেতনা ॥

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ একদা তাদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লালসা এবং উপনিবেশ বিস্তারের নগ্ন উন্মত্ততা প্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশ। আমেরিকা বহুকাল আগে নিজেদের মুক্ত করেছিল সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা থেকে, বাকী থেকে গেল এশিয়া ও আফ্রিকা। আমেরিকা থেকে উৎখাত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যেন অস্থির পৈশাচিকতায় হামলে পড়েছিল ঐ দুটি মহাদেশের ওপর। এখানকার দেশগুলোকে ঐ লোলুপতা প্রতিরোধ অক্ষমতার খেসারৎ দিতে হয়েছে নানাভাবে দীর্ঘকাল ধরে।

সাম্রাজ্যবাদী এলাকা

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শোষণ কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই একদা যাদের অসহায় অক্ষম মনে হয়েছিল তারাই শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। ক্রমশ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় জাতীয়তাবোধ নামে এক অফুরন্ত প্রাণশক্তি। চীনের জাগরণ, জাপানের উত্থান, ভারতের স্বাধীনতা এই প্রাণশক্তিরই এক অত্যুজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ।

স্বাধীনতা স্পৃহা

যদিও দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল প্রস্তুতি, তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই এই সব শোষিত দেশে এনে দিয়েছিল এক সুবর্ণ সুযোগ নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর। ক্রমবর্ধমান জাতীয় সচেতনতা তাদের মনে যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রকাশ ঘটতে থাকে নানাজাতীয় আন্দোলন সংগঠনের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হতে থাকে সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসানের সম্ভাবনা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

॥ অতলান্তিক ঘোষণা ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা মানুষের মন থেকে দূর হতে না হতেই এসে যায় আরেকটি মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশী ভয়াবহ, সর্বনাশা, ব্যাপক ও প্রলয়ংকরী। তাই যুদ্ধ চলাকালেই সূচনা হয় শান্তিপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসের। এমন কি প্রয়াসের প্রমাণ হল অতলান্তিক ঘোষণা।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অতলান্তিক চার্টার নামে এক ঘোষণাপত্রে বলেন, তাঁরা পররাজ্য গ্রাস করবেন না, কোন

রুজভেল্ট

চার্চিল

দেশের সমর্থন ব্যতীত সেই দেশের আঞ্চলিক পরিবর্তন করবেন না, প্রত্যেক দেশের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দেশশাসনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে, আক্রমণকারী দেশকে সামরিক দিক থেকে দুর্বল করে দেওয়া হবে ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই ঘোষণাপত্রেই আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষার পথ-নির্দেশিকা সুস্পষ্ট।

ঘোষণার মূলকথা

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন ॥

যুদ্ধাবসানে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারই ফলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকট প্রশমনই নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পারস্পরিক বিবাদ দূর করে মানব সভ্যতার ভিত্তিকেই দৃঢ়তর করে তোলা।

উদ্দেশ্য

॥ সমাজবাদী মতবাদের সাফল্য ॥

পৃথিবীকে শুধু যুদ্ধের আশংকা থেকে মুক্ত রাখায় নয়, দেশে ও দেশে এবং মানুষে ও মানুষে যে অর্থনৈতিক অসাম্য, বিশ্বব্যাপী অশিক্ষার অন্ধকার ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ এ সবকিছুরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল প্রকৃত শান্তির জন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে যে মতবাদ উৎসাহিত করে অনুপ্রাণিত করে এবং সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পথের নির্দেশ দেয়, তাই হল সমাজতন্ত্র।

প্রকৃত শান্তির লড়াই

স্বাভাবিক কারণেই তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সমাজবাদের জয়জয়কার। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিকতাবাদী শক্তিগুলো আজকের পৃথিবীতে একেবারে

কোণঠাসা। বিশ্বের জাগ্রত জনমত সর্বদাই সোচ্চার আজ যে কোন পররাজ্যগ্রাসী মনোভাবকে পদানত করতে—এক নতুন পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে আজ পৃথিবীতে। অবশ্য নানাভাবেই সংকটের ঘনঘটা মানুষের সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেণ্টাকে বিঘিনত করে একথা অস্বীকার করা যায় না।

● এই অধ্যায়ের মূলকথা ●

বিশ্বে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। জাতিপুঞ্জের কাজকে সহজ করতেই সমাজবাদী চিন্তাধারা আজ বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

॥ অনুশীলনী ॥

১। অতলান্তিক ঘোষণা বলতে কি বোঝ? এই ঘোষণায় কি কি বলা হয়েছিল?
২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কবে গঠিত হয়? জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্দেশ্য কি?
৩। প্রকৃত শান্তিসংগ্রাম বলতে কি বোঝায়? এই সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করে কোন মতবাদ?

● এই অধ্যায়ের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ●

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার—অতলান্তিক সনদ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা—ইহার উদ্দেশ্য—সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য—সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার।

আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ঃ সময়ানুক্রমিক

সময়	স্থান	ঘটনা
১৪৫২-১৫১৯	ইটালী	লিওনার্দোর জীবনকাল
১৪৫৩	কনস্ট্যাণ্টিনোপল	বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন
১৪৫৬	জার্মানি	ছাপাখানা আবিষ্কার
১৪৭৫-১৫৬৪	ইটালী	মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনকাল
১৪৭৩-১৫৪৩	ইটালী	কোপারনিকাসের জীবনকাল
১৪৮৩-১৫২০	ইটালী	রাফায়েলের জীবনকাল
১৪৯২	আমেরিকা	কলম্বাসের আবিষ্কার
১৪৯৮	ভারতবর্ষ	ভাস্কো-দা-গামার আগমন
১৫২৬	ভারতবর্ষ	প্রথম পানিপথের যুদ্ধ
১৫৫৬	ভারতবর্ষ	দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ
১৫৫৬-১৬০৫	ভারতবর্ষ	আকবরের শাসনকাল
১৫৬৪-১৬৪২	ইটালী	গ্যালিলিও-র জীবনকাল
১৬১৫	ভারতবর্ষ	স্যার টমাস রো-র ভারত আগমন
১৬৪৯	ইংলণ্ড	প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ
১৬৮৮	ইংলণ্ড	গৌরবময় বিপ্লব
১৭৫৭	ভারতবর্ষ	পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬১	ভারতবর্ষ	তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ
১৭৬৪	ভারতবর্ষ	বক্সারের যুদ্ধ
১৭৬৫	ভারতবর্ষ	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ
১৭৬৯	ইংলণ্ড	জেম্‌স ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার
১৭৭৬	আমেরিকা	স্বাধীনতা ঘোষণা
১৭৮৯	ফ্রান্স	বাস্তিল দুর্গের পতন
১৭৯৩-৯৪	ফ্রান্স	সন্ত্রাসের যুগ
১৭৯৯	ফ্রান্স	প্রথম কনসাল নেপোলিয়ন
১৮০৫-৭২	ইটালী	ম্যাৎসিনির জীবনকাল
১৮০৭-৮২	ইটালী	গ্যারিবল্‌ডীর জীবনকাল
১৮১০-৬১	ইটালী	ক্যাভুরের জীবনকাল

সময়	স্থান	ঘটনা
১৮১৫	ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া	নেপোলিয়নের পতন ও ভিয়েনা সম্মেলন
১৮১৫-৯৮	জার্মানি	বিসমার্কের জীবনকাল
১৮৫৩	জাপান	কমোডোর পেরীর আগমন
১৮৬১-৬৫	আমেরিকা	গৃহযুদ্ধ
১৮৭০-৭১	ইউরোপ	ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ
১৮৮৫	ভারতবর্ষ	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৯০৪	এশিয়া	রুশ-জাপান যুদ্ধ
১৯০৫	ভারতবর্ষ	বঙ্গভঙ্গ
১৯১১	চীন	প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
১৯১৪-১৮		প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
১৯১৭	রাশিয়া	বলশেভিক বিপ্লব
১৯২৪	রাশিয়া	লেনিনের মৃত্যু
১৯২০	ভারতবর্ষ	অসহযোগ আন্দোলন
১৯৩০	ভারতবর্ষ	আইন অমান্য আন্দোলন
১৯৩৯-৪৫		দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
১৯৪২	ভারতবর্ষ	ভারত ছাড় আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন
১৯৪৭	ভারতবর্ষ	স্বাধীনতা লাভ
১৯৪৯	চীন ও ইন্দোনেশিয়া	কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা লাভ
১৯৪৮	ব্রহ্মদেশ	স্বাধীনতা লাভ
১৯৫৫	ইন্দোচীন	স্বাধীনতা লাভ
১৯৬৩	মালয়েশিয়া	ফেডারেশন গঠন

———